হিন্দুর সমাজ-বিবর্ত্তন ও স্বামী প্রণবানন্দ

স্বামী নির্ম্মলানন্দ

হিন্দুর সমাজ-বিবর্ত্তন
ও
স্বামী প্রণবানন্দ

স্বামী নির্ম্মলানন্দ

প্রকাশক—

স্বামী কৈবল্যানন্দ
ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ
২১১, রাসবিহারী এভিনিউ
কলিকাতা ১৯, ফোন ৪৪০-৫১৭৮

প্রথম সংস্করণ—

শ্রীশ্রীগুরুপূর্ণিমা
১৪ই শ্রাবণ, ১৪০৩, ইং ৩০ জুলাই, ১৯৯৬

মূল্য : কুড়ি টাকা মাত্র

মুদ্রণ—

শ্রীতেজেন্দ্রনাথ সরকার
ক্লাসিক প্রেস
২১, পটুয়াটোলা লেন
কলিকাতা - ৯

ভূমিকা

ডঃ নিমাই সাধন বসু
(প্রাক্তন উপাচার্য্য, বিশ্বভারতী)

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রবীণ সন্ন্যাসী স্বামী নির্মলানন্দ তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছেন তাঁর ইষ্টগুরু স্বামী প্রণবানন্দের জাতিগঠনে ও মানব সেবার আদর্শকে রূপায়িত করতে। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ ব্যাপকভাবে পরিচিত একটি হিন্দু সংগঠন রূপে। এই সঙ্ঘের সেবাকার্য এবং জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে মানুষের চরম বিপদের দিনে তার পাশে এসে সহযোগিতা, সাহায্য ও সাহস জুগিয়ে সুস্থ, স্বাভাবিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার নিরলস প্রচেষ্টা সকলের শ্রদ্ধা এবং আস্থা অর্জন করেছে। এক মহান্ ঐতিহাসিক পুরুষের জীবন ও বাণী কেমন ভাবে কার্যকর করা যায় তার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে এই প্রতিষ্ঠান। এটি সম্ভব হয়েছে প্রবীণ ও নবীন সন্ন্যাসী এবং প্রণবানন্দজীর অসংখ্য ভক্ত ও গুণগ্রাহীদের মিলিত প্রচেষ্টার ফলে। নির্মলানন্দজী এই বৃহৎ কর্মযজ্ঞের এবং হিন্দু তথা মানুষের ধর্মের প্রচার ও প্রসারের মহান্ উদ্যোগের একজন পরম শ্রদ্ধেয় সন্ন্যাসী।

আমার সঙ্গে নির্মলানন্দজীর প্রথম পরিচয়ের সূত্র কিন্তু কিছুটা ভিন্ন ক্ষেত্রে। সেই ক্ষেত্রটি হল ইতিহাস ও ঐতিহাসিক গবেষণা। প্রণবানন্দজী, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের ঐতিহাসিক গুরুত্ব এবং অবদান আধুনিক বাংলার তথা ভারতবর্ষের নবজাগরণের ইতিহাসে এখনো উপযুক্ত স্বীকৃতি পায়নি। এটি অত্যন্ত দুঃখের কথা। অথচ, তথ্যের কোনো অভাব নেই। বেশ কয়েক বছর আগে কৌতূহলী হয়ে আমি ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে গিয়েছিলাম এই বিষয়ে খোঁজখবর নিতে। তখন নির্মলানন্দজীর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। আমি অপ্রত্যাশিত ভাবে লাভবান হয়েছিলাম দুটি কারণে। প্রথমটি হল, নির্মলানন্দজীর কাছে জেনেছিলাম কত তথ্য রয়েছে। প্রণবানন্দজী, তাঁর জীবন এবং দর্শন সম্বন্ধে কত জানার রয়েছে, গবেষণার সুযোগ

রয়েছে। সর্বপ্রকার সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি পেয়েছিলাম নির্মলানন্দজীর কাছে। জানিয়েছিলেন আতিথেয়তা, সর্বপ্রকার সহযোগিতা গবেষকদের জন্যে সুনিশ্চিত। দ্বিতীয়টি হল, এমন এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে পরিচয় যা এক বিরল অভিজ্ঞতা। বিদ্যাচর্চা, বিশেষ করে ইতিহাস চর্চা সম্বন্ধে তাঁর অসীম আগ্রহ। কথাবার্তায় মনে হয়েছিল নির্মলানন্দজী শুধুমাত্র একজন নিবেদিতপ্রাণ সন্ন্যাসী নন। ইতিহাস-সচেতন এক বিশাল হৃদয় ও উদারচেতা মানুষ। তাঁর উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় অধ্যাপিকা পাপিয়া চক্রবর্তীর পক্ষে তাঁর মূল্যবান গবেষণা গ্রন্থ, Hindu Response to Nationalist Ferment, লেখা সম্ভব হয়েছিল। এই গ্রন্থেই সর্বপ্রথম প্রণবানন্দজী ও ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের বহুমুখী অবদানের স্বীকৃতি ও প্রকৃতির মূল্যায়ন হয়েছে। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের ঐতিহাসিক গুরুত্ব এখন অধিকতর স্বীকৃতি পাচ্ছে।

নির্মলানন্দজীর ইতিহাস-জ্ঞান ও ইতিহাস-চেতনায় মুগ্ধ হয়েছিলাম। কিন্তু তাঁর 'হিন্দুর সমাজ বিবর্তন ও স্বামী প্রণবানন্দ' গ্রন্থটি পড়ে আমি বিস্মিত হয়েছি। একটি সীমিত আকারের গ্রন্থে এত ঐতিহাসিক তথ্য, ধর্মীয় ও সামাজিক বিবর্তনের ইতিহাস ও বিশ্লেষণ থাকতে পারে তা গ্রন্থটি না পড়া পর্যন্ত বিশ্বাস হবে না। প্রাচীন যুগ থেকে একেবারে বর্তমান কাল পর্যন্ত ভারতবর্ষের ধর্মীয় ও সামাজিক বিবর্তনের ইতিহাস বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করা স্বীকৃত ঐতিহাসিক বা Professional Historians দের পক্ষেও দুরূহ কাজ। নির্মলানন্দজী এই প্রায় দুঃসাধ্য কাজটি করেছেন। সফল হয়েছেন। নিপুণ শিল্পীর মত তুলির টানে তিনি এক সুন্দর ছবি তুলে ধরেছেন। ছবির কেন্দ্রবিন্দু স্বামী প্রণবানন্দ হলেও তাঁর সম্বন্ধে খুব বেশি পৃষ্ঠা লেখা হয়নি। কিন্তু ঐতিহাসিক পটভূমি ও পরিমণ্ডলটি এমন সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে যে ওই প্রেক্ষাপটে স্বামী প্রণবানন্দ যেন আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছেন। এটি লেখক নির্মলানন্দের এক বড় সাফল্য।

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী থেকে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত হিন্দুসমাজের বিবর্তনের জটিল ইতিহাস গ্রন্থটিতে যে ভাবে আলোচিত হয়েছে

তা সত্যিই প্রশংসনীয়। তথ্য ও সুচিন্তিত বিশ্লেষণের সুন্দর সমন্বয় ঘটেছে সংক্ষিপ্ত আলোচনায়। লেখকের দৃষ্টিকোণ ও মন্তব্যের সঙ্গে সকল ক্ষেত্রেই যে পাঠক সহমত হবেন তা নয়। কোনো লেখক বা পাঠকই তা আশা করেন না। নির্মলানন্দজী সন্ন্যাসী। আদর্শ-নিষ্ঠ হিন্দু। স্বামী প্রণবানন্দের আদর্শ ও শিক্ষাকে তিনি জীবন-বেদ রূপে গ্রহণ করেছেন। সুতরাং, সেই বিশ্বাস, আদর্শের প্রতি অবিচল শ্রদ্ধা এবং আনুগত্য তাঁর গ্রন্থে প্রতিফলিত হওয়া প্রত্যাশিত। কিন্তু যেটি পাঠককে মুগ্ধ করবে তা হল তাঁর ইতিহাসের গতি ও ভিন্নমুখী ধারাগুলি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা। তথ্য সম্বন্ধে জ্ঞানের গভীরতা। অত্যন্ত সহজ, সুস্পষ্ট ভাষায় নিজস্ব ধারণা ব্যক্ত করার ক্ষমতা। আর একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল বিভিন্ন ঐতিহাসিক পুরুষ, ধর্ম-সংস্কারক, ধর্মীয় ও সামাজিক আন্দোলন সম্বন্ধে সমালোচনা মূলক মন্তব্যের মধ্যেও শ্রদ্ধার প্রকাশ। কোনো ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ ভিন্ন মত পোষণ করলেও অকারণ উষ্মা বা উপেক্ষার ভাব ফুটে ওঠেনি। সন্ন্যাসীর অন্তর ও বাইরের স্নিগ্ধতা তাঁর গ্রন্থেও সুস্পষ্ট। অথচ, নিজের অভিমত, উপলব্ধি এবং প্রয়োজনে কঠোর অপ্রিয় সত্য ব্যক্ত করতে তিনি কুণ্ঠিত নন। সাম্প্রদায়িক সমস্যার কারণ বিশ্লেষণ করার সময় তিনি ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ করতে দ্বিধা করেন নি। কোন্ পরিস্থিতিতে, কেন ও কী ভাবে স্বামী প্রণবানন্দ হিন্দুসমাজকে ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী করতে এগিয়ে এসেছিলেন তা তিনি বিবৃত করেছেন। হিন্দুর ধর্ম ও সম্প্রদায়ের শক্তির উৎস, সামাজিক ভিত্তি, মানবিকতার আদর্শ ও ঔদার্য্যের কথা তিনি বলেছেন। কিন্তু তার মধ্যে কোনো সঙ্কীর্ণতা নেই। অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি অশ্রদ্ধার লেশ মাত্র নেই। বর্তমান প্রচলিত অর্থে তিনি 'ধর্ম নিরপেক্ষ' হয়তো নন। কিন্তু হিন্দু ভারতবর্ষে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েও কেন ভারতে ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের আদর্শ গৃহীত হয়েছে তা তাঁর গ্রন্থটি পড়লে বুঝতে সুবিধা হবে।

হিন্দুসমাজের অখণ্ডতা ও সংহতি রক্ষার জন্যে কুসংস্কার, নানাবিধ সামাজিক ব্যাধি ও সঙ্কীর্ণতা দূর করার ওপর প্রণবানন্দজী

কেন সর্বাপেক্ষা বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন তা বইটিতে সংক্ষেপে অথচ সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রকৃত হিন্দু-ঐক্য ও সংহতি সমগ্র দেশের সংহতি এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সুদৃঢ় করার জন্যে যে অপরিহার্য এই বক্তব্যটি যুক্তি সহকারে তিনি প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন।

আর একটি কারণে নির্মলানন্দজীর গ্রন্থটি মূল্যবান বিবেচিত হবে। 'দেবল স্মৃতি', কৌলিন্য প্রথা, স্মার্ত্ত রঘুনন্দন, শ্রীচৈতন্য, দেবীবর ঘটক ও মেলবন্ধন প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ও প্রসঙ্গে আলোচনাগুলি অনুসন্ধিৎসু পাঠকের মনে গভীর আগ্রহের সৃষ্টি করবে। এত সংক্ষেপে এত সুন্দর আলোচনা সত্যিই বিরল। উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণ সম্পর্কে এমন অনেক প্রশ্ন নির্মলানন্দজী তুলেছেন, নির্ভীকভাবে নিজের অভিমত প্রকাশ করেছেন, যা চিন্তাশীল পাঠককে আকর্ষণ করবে। আলোচনা-বিতর্কে উৎসাহিত করবে। যে কোনো গ্রন্থের এটি এক সার্থকতা। সেই সাফল্য লেখক দাবি করতে পারেন।

'হিন্দুর সমাজ-বিবর্ত্তন ও স্বামী প্রণবানন্দ' গ্রন্থটি পড়ে আনন্দ পেয়েছি ও উপকৃত হয়েছি। প্রথিতযশাঃ ঐতিহাসিকও এত সংক্ষেপে এত বিশাল ও দুরূহ বিষয় সম্বন্ধে লিখতে সাহস করবেন কি না সন্দেহ। আপাত দৃষ্টিতে এ রকম প্রচেষ্টা দুঃসাহসিক মনে হবে। কিন্তু নির্মলানন্দজী এই দুঃসাহস দেখিয়েছেন। কেন না, তিনি প্রণবানন্দজীর জীবন ও বাণীকে অন্তরে গ্রহণ করেছেন, আত্মস্থ করেছেন। কোনো ভয়ই তাঁর নেই। সুনাম-দুর্নাম ও প্রশংসা-সমালোচনায় তিনি খুশিও নন, অখুশিও নন। যা তাঁর বিশ্বাস ও উপলব্ধি তাই লিখেছেন। অথচ, তাঁর ইতিহাসবোধ ও চেতনা তিনি বর্জন করেন নি। যুক্তি ও তথ্য তাঁর গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য। এই কৃতিত্ব কম লেখকই দাবি করতে পারেন।

নিবেদন

যুগাবতার স্বামী প্রণবানন্দের অশেষ করুণায় প্রকাশিত হলো —"হিন্দুর সমাজ-বিবর্ত্তন ও স্বামী প্রণবানন্দ।" ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিকতার ভিত্তিতে হিন্দুর জরাজীর্ণ সমাজের আমূল সংস্কার ও অখণ্ড সংগঠন ছিল তদীয় ভাগবত অভিপ্রায়। এই অভিক্ষেপ থেকে পর্য্যালোচনাপূর্ব্বক তদীয় এই আন্দোলনের মৌলিকতার এক সংক্ষিপ্ত রূপরেখা তুলে ধরার স্বার্থেই অযোগ্য লেখকের ক্ষুদ্র প্রয়াস। দেশের যাঁরা বিদগ্ধ জন তাঁদের লেখনীতেই কাজটি হতো যথার্থ ও সর্ব্বোত্তম। কিন্তু তা হয়নি।

স্বামী বিবেকানন্দের পর স্বামী প্রণবানন্দও যে একজন স্বদেশপ্রেমী ঐতিহাসিক সন্ত পুরুষ তা বুঝতে কোথায় যেন কিছু দ্বিধা ও আড়ষ্টতা আছে এক শ্রেণীর বিদ্বান্, বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক তথা ঐতিহাসিকদের উচিত সমীক্ষায়। স্বামী প্রণবানন্দ কথা বলতেন কম, বক্তৃতা করতেন না, বই লিখেন নি। এখানেই কি দৈন্য? কিন্তু একথা কে অস্বীকার করবে যে, খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর নব জাগরণের সুযোগ্য উত্তরাধিকার বহন ক'রেই এই বঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের জীবৎকালেই ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে নব শিশুরূপে আবির্ভূত হন স্বনামধন্য স্বামী প্রণবানন্দ এবং বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশক পর্য্যন্ত লীলাশরীরে বর্ত্তমানপূর্ব্বক জাতীয় জাগরণকে তিনি দিতে চান মহাজাগরণের রূপ? এখানেই কি স্বামী প্রণবানন্দ সমকালীন ঐতিহাসিক পুরুষগণের অন্যতম নহেন?

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ—এই যুগান্তকারী অধ্যাত্ম পুরুষের যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের বিশ্বব্যাপী যন্ত্রস্বরূপ। তদীয় শ্রীকণ্ঠের ঘোষণা—এ সঙ্ঘের রচনা সর্ব্বনিয়ন্তার শুভ ইচ্ছায়।" জীবনের কুড়িটি বৎসর তিনি শ্মশানচারী—কঠোর যোগসাধনায় কৃচ্ছ্রব্রতী। সর্ব্বনিয়ন্ত্রী মহাশক্তি যেন এমনই একটি পরিশুদ্ধ আধারের অপেক্ষায় ছিলেন যাঁর যুগব্যক্তিত্ব আশ্রয়পূর্ব্বক তদীয় ভাগবতী ইচ্ছা বাস্তবায়িত হবে। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে মহাযোগীর সিদ্ধিলাভ। নির্ব্বিকল্প সমাধিব্যুত্থানে তদীয় শ্রীকণ্ঠে উচ্চারিত হয় চারটি অভিনব যুগসন্দেশ—"এ যুগ

—মহাজাগরণের যুগ; এ যুগ—মহাসমন্বয়ের যুগ; এ যুগ—মহামিলনের যুগ; এ যুগ—মহামুক্তির যুগ।" এ মন্ত্রচতুষ্টয় যুগের নব আর্য ঋক্—নব মহাবাক্য। এ গর্জ্জন কে, কোন্ যুগে, কার কম্বুকণ্ঠে শুনেছেন? দ্রষ্টা পুরুষ ব্যতীত এরূপ স্বল্প সূত্রবাক্যে যুগের সামূহিক অনুভবকে কেহ কি অভিব্যক্ত করতে পারেন? নব যুগ রচনার এই নব বীজমন্ত্র জাতির প্রসুপ্ত কুলকুণ্ডলিনীর উজ্জীবনে কি সাড়া জাগায় না? কত বড় 'মিশন' নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন স্বামী প্রণবানন্দ তার মর্ম্মার্থ ব্যাখ্যায় আর কি ঝুড়ি ঝুড়ি বাক্যব্যয়ের প্রয়োজন আছে?

স্বামী প্রণবানন্দের সামগ্রিক জীবনদর্শন ও জীবনব্রতের মৌলিক উৎস এই মহাজাগরণ, মহামিলন, মহাসমন্বয় ও মহামুক্তি। এটি না বুঝলে স্বামী প্রণবানন্দ ও তদীয় কর্ম্মচক্রের প্রকৃত রহস্য আমাদের অজ্ঞাতই থেকে যাবে। এই মন্ত্রচতুষ্টয়ের বাস্তব রূপায়ণেই তদীয় মঙ্গল হস্তে মহাসঙ্ঘের বিরচন। এই নব বেদকে আবর্ত্তিত করেই স্বামী প্রণবানন্দের যাবতীয় লোককল্যাণ চিন্তার উৎসার। এই ভূমি থেকে তিনি এক চুলও নড়েন নি। স্বল্পায়ুঃ জীবনে তিনি একের পর এক আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক, শৈক্ষিক, মানবকল্যাণকর আন্দোলনের প্রবল আবর্ত্তের স্রষ্টা। তিলে তিলে উৎসর্গ ক'রে দিয়েছেন আপনাকে মানুষের সেবায়—সমাজের হিতকামনায়। হিন্দুর সমাজ-বিবর্ত্তনের যুগ যুগব্যাপী অস্থিরতা নিরসনপূর্ব্বক তাকে এক সুস্থিত অনুকূল ভূমিতে সংস্থাপনেও উল্লিখিত যুগমন্ত্রেরই প্রভাব সম্পাত। তিনি কোন হাতুড়ে সমাজ-সংস্কারক নহেন—পরন্তু ত্রিকালদর্শী মহাযোগী। তৎপ্রবর্ত্তিত সকল কর্ম্মই বেদানুকূল ধর্ম্মাশ্রিত। অন্যান্য সংস্কার আন্দোলনের সাথে স্বামী প্রণবানন্দের সংস্কার আন্দোলনের মূল পার্থক্য এইখানে। এটিও ভাল ক'রে বুঝতে হবে।

গ্রন্থপাঠে আমরা দেখবো—সমাজের তাৎক্ষণিক সমস্যাবলীর নিরসনে স্বামী প্রণবানন্দ একান্ত উদাসীন নহেন। কিন্তু তদীয় অভিপ্রায় আত্যন্তিক আমূল সংস্কার। এই আমূল সংস্কারের প্রয়াসে কোন আপাত চমকের যাদু যদি কেউ দেখতে চান তবে তিনি

নিরাশ হবেন। কারণ, সমাজের যে বর্ত্তমান জরাজীর্ণ দুরবস্থা তা তো একদিনের সঞ্চয় নয়—তা বহুকালের। স্বামী প্রণবানন্দ চেয়েছেন দীর্ঘ দিনব্যাপী যোগ্য পরিচর্য্যার দ্বারা অশেষ আময়গ্রস্ত সমাজ-শরীরকে ক্রমিক উৎকর্ষে সুস্থ ও বলিষ্ঠ ক'রে তুলতে। তাই কোন আঘাত নয়, দ্বন্দ্ব নয়, তিরস্কার নয়, হঠকারিতা নয়, প্রতিক্রিয়ার বিপ্লব সৃষ্টি নয়—তিনি বেছে নেন সেবার পথ, সহানুভূতির পথ, ভালবাসার পথ, সমন্বয়ের পথ। এই সত্যদ্রষ্টা পুরুষ নিপুণ শিল্পীর মতই অশেষ ধৈর্য্যে গড়ার কাজে আত্মোৎসর্গ করেন। সন্দেহ নেই—মানুষ আশু ফলের প্রত্যাশী। কিন্তু তাঁরা ভুলে যান যে, গাছটি পুঁতলেই হাতে হাতে ফল পাওয়া যায় না। গাছটিকে বাড়িয়ে তুলতে হয় ধীরে ধীরে সার, পরিসেচন ও পরিরক্ষণের দ্বারা। গাছটির ক্রমিক পরিবৃদ্ধিই ফললাভের ক্রমিক সূচনা। শিশুটি সাবালক হয় কালনিয়মের বিধি মেনে। তাকে দিতে হয় তুষ্টি, পুষ্টি ও বাৎসল্য। তাকে কি হঠাৎ টেনে লম্বা করা যায়? তাহলে তো শিশুটি মরেই যাবে। তেমনি আমূল সংস্কার কোন জবরদস্তির কাজ নয়। অথচ এই জবরদস্তির কাজই চলেছে কয়েক শতাব্দী ব্যাপী। ফলে সংস্কার হয় নি—হয়েছে সংহার। এই ভ্রান্তির পরিমার্জ্জন দেখি স্বামী প্রণবানন্দে, আর সেইটিই আলোচ্য গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য।

গ্রন্থবিস্তারের প্রারম্ভে আমরা স্মৃতিপ্রোক্ত সমাজ-নীতির আদি পটভূমি প্রেক্ষাপটে রেখেছি। অতঃপর পর্য্যালোচিত হয়েছে বঙ্গের তথা ভারতের বিগত আটশত বৎসরের প্রাসঙ্গিক ইতিহাস, পরীক্ষা করা হয়েছে এই সুদীর্ঘ কালের প্রধান প্রধান সমাজ-সংস্কার আন্দোলনাবলীর গুণাগুণ ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। উপসংহার পর্ব্বে এসেছেন স্বামী প্রণবানন্দ। কোন্ পথে, কি উপায়ে, কি কি কর্ম্মপ্রকল্পের মাধ্যমে তিনি সমাজের আমূল সংস্কার ও অখণ্ড সংগঠন আনয়নে ব্রতী হয়েছিলেন এবং তৎপ্রবর্ত্তিত আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য ও উপযোগিতা কোথায়, তা যথাসাধ্য আলোচিত হয়েছে। আলোচনা কত দূর সার্থক, সে বিচার করুন সুধী ও বিদ্বজ্জনেরা।

—গ্রন্থকার

সূচীপত্র



আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ

হিন্দুর সমাজ-বিবর্ত্তন ও স্বামী প্রণবানন্দ

প্রথম অধ্যায়

আদি পটভূমি

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী থেকে বর্ত্তমান বিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত যুগে যুগে এই দেশে হিন্দুসমাজে যে সকল বিবর্ত্তন ঘটেছে, তারই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আলোচনা-পূর্ব্বক উপসংহারে যুগাবতার স্বামী প্রণবানন্দের ধর্ম্মীয় ভিত্তিক নব হিন্দু-সমাজ গঠনের নব ধারার যুগোপযোগিতা পাঠকগণের সম্মুখে তুলে ধরতে চাই। এই উপসংহার পর্য্যন্ত পৌঁছাতে পাঠকবৃন্দকে কিছু ধৈর্য্য অবলম্বন করতে হবে। কারণ, দীর্ঘ আটশত বৎসরের ইতিহাস এক নিঃশ্বাসে প্রকাশের বিষয় নহে।

ধর্ম্মশাস্ত্রের যুগ

হিন্দু-সমাজের বিধি-বিধান ও বিবর্ত্তনধারা সম্বন্ধে যে কোন আঞ্চলিক আলোচনার পটভূমিতে একথা সর্ব্বাগ্রে স্মরণীয় যে, হিন্দুধর্ম্ম বেদভিত্তিক, তার সমাজ-ব্যবস্থাও বেদানুগ। বৈদিক বর্ণাশ্রমধর্ম্মের মূল আন্তর কাঠামোকে স্বীকার ক'রেই আজো ভারতের সকল অঞ্চলের সমাজ-রীতি দাঁড়িয়ে আছে, যদিও তার বাইরের কাঠামোর বিবর্ত্তন সকল প্রদেশেই ঘটেছে যুগে যুগে। বেদ—নিত্য, অপৌরুষেয়—তাঁর কোন পরিবর্ত্তন বা বিবর্ত্তন স্বীকার্য্য নয়। কিন্তু সেই সনাতন বৈদিক আদর্শ ও সাধনাকে সমাজের বাস্তব ক্ষেত্রে রূপায়ণের স্বার্থে প্রয়োজন হয়েছিল কতক উপযোগী গ্রন্থের। এ প্রসঙ্গে প্রাচীন শ্রৌতসূত্র, গৃহ্যসূত্র ও ধর্ম্মসূত্রের কথা আমরা স্মরণ করতে পারি। শ্রুতিবিহিত যজ্ঞাদি বিষয়ক সূত্রাবলীর নাম—শ্রৌতসূত্র। গৃহ্যসূত্রাবলীতে গৃহকার্য্য-সম্পাদ্য যজ্ঞাদির বিবরণ পাওয়া যায়। আর পারমার্থিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্ত্তব্যাদি নির্ণয়

করে ধর্ম্মশাস্ত্র। ঋগ্বেদীয়, সামবেদীয়, কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় ও শুক্লযজুর্ব্বেদীয় কল্পসূত্রগুলির সম্যক্ আলোচনা অতি দীর্ঘ।

শ্রৌতসূত্র ও গৃহ্যসূত্রোক্ত যজ্ঞের আগুন নিভে গেছে বহুকাল। কিন্তু ধর্ম্মসূত্রে সামাজিক, পারিবারিক ও রাজনৈতিক যে সকল বিধান বর্ণিত, রূপান্তরিত আকারে তৎসমুদয় অদ্যাবধি বিদ্যমান। তবে সূত্রাকারে নয়—গদ্যের পরিবর্ত্তে অনুষ্টুভ কাব্যছন্দে। এ সকল গ্রন্থই বর্ত্তমানে ধর্ম্মশাস্ত্র বা ধর্ম্মসংহিতা নামে খ্যাত। এঁদের সংখ্যা অনেক। তন্মধ্যে বিশখানির প্রসিদ্ধি অধিক। মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, অত্রি, পরাশর, বিষ্ণু, হারীত, অঙ্গিরা, উশনা, যম, আপস্তম্ভ, সম্বর্ত্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গৌতম, শাতাতপ, বশিষ্ঠ —প্রভৃতি সংহিতাকারগণের রচিত গ্রন্থ তৎ তৎ নামে প্রচলিত। এ ছাড়াও আছে আঠারোখানি স্মৃতিগ্রন্থ। যথা—প্রজাপতি, লঘুশঙ্খ, শঙ্খ-লিখিত, ঔশনস, বৃহৎ যম, লঘু যম, অরুণ, অত্রি, আঙ্গিরস, কপিল, লঘ্বাশল্বায়ন, বাধূল, বৃদ্ধহারিত, লোহিত, দাল্‌ভ্য, কণ্ব, বৃহৎ পরাশর এবং নারদ।

ধর্ম্মশাস্ত্রের কাল-পারম্পর্য্য

আমাদের মুখ্য আলোচনার বিষয়—সমাজ-বিবর্ত্তনের বিচিত্র যুগধারা। এই বিবর্ত্তন মধ্যযুগ বা আধুনিক যুগেরই বিষয়বস্তু নয় —এই বিবর্ত্তন বহু প্রাচীন। বেদসম্মত শ্রৌতসূত্র, গৃহ্যসূত্র ও ধর্ম্মসূত্রের যুগ থেকেই এই বিবর্ত্তনের ধারা লক্ষ্যণীয়। স্মৃতি এবং ধর্ম্ম-সংহিতার যুগে এই বিবর্ত্তন অধিকতর সুস্পষ্ট। অধিকাংশ পণ্ডিতই মনে করেন—মনুসংহিতাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও সুবিস্তৃত। এমন মতও আছে যে, মনুসংহিতাই সমগ্র বিশ্বে প্রথম ব্যবহারিক গ্রন্থ, যার প্রশংসা প্রশ্নাতীত। যাজ্ঞবল্ক্যাদি সংহিতার খ্যাতিও উপেক্ষণীয় নয়। কিন্তু সকল সংহিতা ও স্মৃতি-শাস্ত্রই একই কালে এবং একই অঞ্চলে রচিত নয়। এঁদের উৎপত্তি বিভিন্ন কালে এবং বিভিন্ন অঞ্চলে। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় বৌদ্ধভিক্ষু ও বৌদ্ধভিক্ষুণীদের নাম পাওয়া যায়। বিদগ্ধ রমেশ দত্তের মতে, বিষ্ণুসংহিতার কোন

কোন অংশ অপেক্ষাকৃত আধুনিক। এই সংহিতায় সতীদাহের কথা আছে, ম্লেচ্ছদের উল্লেখ আছে এবং আধুনিক তীর্থস্থানগুলির নামের বিবরণও আছে। রমেশ দত্ত মনে করেন—অত্রি, হারীত, উশনা, অঙ্গিরা, যম, সম্বর্ত্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতির নামে যে সকল সংহিতাগ্রন্থ পাওয়া যায়, তৎ সমুদয় অপেক্ষাকৃত আধুনিক। অত্রি সংহিতায় ম্লেচ্ছদিগের ও সতীদাহের উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু মনু বা যাজ্ঞবল্ক্যাদি সংহিতায় সতীদাহের কোন উল্লেখ নেই। হারীত সংহিতায় বিষ্ণুর নাভি থেকে ব্রহ্মার জন্ম প্রভৃতি পৌরাণিক কাহিনী বিবৃত। উশনা সংহিতাও সতীদাহের সমর্থক। অঙ্গিরার বচনও তাদৃশ। বিশেষতঃ ইহাতে নীল চাষের উল্লেখ আছে। কাত্যায়ন সংহিতায় গণেশ, গৌরী, পদ্মা, সচী, সাবিত্রী, জয়া, বিজয়া প্রভৃতি পৌরাণিক ও আধুনিক দেবদেবীর পূজার বিবরণ বিবক্ষিত। পরাশর এবং ব্যাস উভয়েই সহমরণের প্রশংসা করেন। পুনশ্চ "নষ্টে মৃতে" ইত্যাদি পরাশর বচনের (৪।১৬) ব্যাখ্যায় কোন কৌশল আশ্রয় না করলে সাদা অর্থে বুঝা যায় এই ঋষি যেন বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিধবা-বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ ও নারীর পত্যন্তর গ্রহণের পক্ষপাতী। শাতাতপ-সংহিতা প্রতিপন্ন করেন—ব্রাহ্মণকে দান করলে সর্ব্ববিধ পাপ ও অমঙ্গল থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। এ সকল উক্তিই প্রমাণ করে যে, অনেকগুলি সংহিতাই আধুনিক কালে রচিত। স্মৃতিগ্রন্থ সম্বন্ধেও একই কথা। এখানেও কালের ব্যবধান স্বীকার্য্য। প্রাচীনতর ধর্ম্মসূত্রের বিবর্ত্তিত রূপ মনুসংহিতার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে অবশ্য পণ্ডিতগণের কোন দ্বিমত নেই। পণ্ডিতপ্রবর রমেশবাবু মনে করেন যে, খৃষ্টজন্মের বহুপূর্ব্বেই মনুসংহিতার আবির্ভাব। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা মনুর পরবর্তী হলেও ইহার প্রাচীনত্ব অস্বীকার্য্য নয়। লক্ষ্যণীয় যে, সকল স্মৃতি ও সংহিতাই সর্ব্বক্ষেত্রে সহমত নয়। যেমন পিতৃধনের অধিকার সম্বন্ধে মনু উপরম-স্বত্ববাদের প্রবক্তা, যাজ্ঞবল্ক্য কিন্তু জন্মস্বত্ববাদের প্রবর্ত্তক। ধর্ম্মসংহিতাগুলির ভিতর নানা প্রসঙ্গে এইরূপ মতপার্থক্য কেন? উত্তর সেই একটাই—যুগে যুগে সমাজ-বিবর্ত্তনের দেশকালোপযোগী প্রয়োজন বিচারেই এরূপ ঘটা সম্ভব।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হয়েছে—হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজব্যবস্থা বেদভিত্তিক। বেদধর্ম্মকে সামাজিক ক্ষেত্রে বাস্তব রূপায়ণের স্বার্থেই প্রাচীন শ্রৌতসূত্র, গৃহ্যসূত্র, ধর্ম্মসূত্র এবং তৎপরবর্ত্তী ধর্ম্ম-সংহিতা ও স্মৃতি সাহিত্যের উৎপত্তি। কিন্তু বেদধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণের স্বাধীনতা কোন স্মৃতিকার বা সংহিতাকারগণকেই দেওয়া হয় নি। বেদের সহিত বিরোধ ঘটে এমন কোন বচন কোন স্মৃতি বা সংহিতাশাস্ত্রে প্রযুক্ত হ'লে অবশ্যই তা বর্জ্জনীয়—"শ্রুতিস্মৃতি-বিরোধে তু শ্রুতিরেব গরীয়সী।"

যুগে যুগে সমাজ-বিবর্ত্তন কেন ঘটে?

প্রশ্ন জাগে—সমাজের বহিরঙ্গে যুগে যুগে এতাদৃশ বিবর্ত্তন কেন ঘটে? প্রথম উত্তর—ইহা কালেরই ক্রিয়া। জগৎবৈচিত্র্যে ভাঙ্গা-গড়ার কাজ চলছে অবিরাম। কাল পুরাতনকে আবশ্যকানুযায়ী ভাঙ্গে, আবার নূতন সুন্দর সৃষ্টি উপহার দেয়। সমাজ-ধর্ম্মের সনাতন আন্তঃপ্রকৃতিকে ভাঙ্গবার শক্তি কিন্তু কালের নেই। যা নিত্য সত্যের ভিত্তিতে গড়া, তার উপর আঘাত চলে না। কিন্তু সমাজের বহিরঙ্গের যে লৌকিক সত্তা তা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে না, তার রূপান্তর যুগে যুগেই ঘটে। তখনই আবির্ভাব ঘটে নূতন নূতন সংহিতাকারগণের এবং সংহিতাযুগোত্তর স্মৃতিনিবন্ধকারবৃন্দের। এই সাময়িক সামাজিক বিবর্ত্তন সমাজধর্ম্মের মূল প্রাণসত্তাকে যাতে সংহার না করে, সেই দিকে দৃষ্টি রেখেই তাঁরা নব নব কালোপযোগী ব্যাখ্যার আলোকে উচিত মীমাংসা ও হিতকর সমন্বয় বিধান দিয়ে সমাজকে কালের বিপর্য্যয় থেকে রক্ষা করেছেন এবং এই বিরোধ-মীমাংসা ও নববিন্যাসের ক্ষমতা গুণেই সমস্ত প্রকার বিপদ উত্তরণপূর্ব্বক হিন্দুসমাজ লাভ করেছে কালজয়ী মহাজীবন। নচেৎ যুগের পর যুগব্যাপী যে সকল উত্তাল ঝড় ঝঞ্ঝা ভারতের উপর এসেছে, তাতে হিন্দু-সমাজের চিহ্নমাত্র থাকার কথা নয়।

সমাজ-বিবর্ত্তনের কারণাবলী

সমাজ বিবর্ত্তনের বিশেষ কারণগুলি কি কি? বিদেশী ও বিধর্ম্মীর আক্রমণ ও কুশাসন, দেশের আভ্যন্তরিক রাজ্যাধিকার পরিবর্ত্তন, অরাজকতা, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় বিপ্লব, গৃহবিবাদ, মানুষের আদর্শচ্যুতি ও অনৈতিকতা—এ সকলের প্রভাবও সমাজ-জীবনে অবশ্যম্ভাবী। দেশের আঞ্চলিক ভাষা, জলবায়ু, লোকাচার, জীবিকার সুবিধা-অসুবিধা, কালভেদে রুচির পরিবর্ত্তন প্রভৃতি কারণেও আচার-বিচারের তারতম্য ঘটে থাকে। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না—আমরা আর্য্যহিন্দুর সন্তান—আমরা বেদধর্ম্মী, বিপর্য্যয়কে জয় করার ভিতরেই আমাদের সর্ব্বোত্তম গৌরব। যুগাচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দের বাণী—"আত্মস্মৃতি ও আত্মানুভূতিই প্রকৃত জীবন, আর আত্মবিস্মৃতিই মহামৃত্যু"। সর্ব্বদা স্মরণে রাখবে—"শুক-সমীক-শঙ্করাচার্য্যের বংশধর আমরা। তাঁহাদেরই পবিত্র শোণিতস্রোত আমাদের ধমনীতে ধমনীতে প্রবাহিত।" এইরূপ চিন্তাদ্বারা আত্মশক্তিতে বিশ্বাস জাগিয়ে রাখলে যুগবিপর্য্যয়ে পতনের সম্ভাবনা আর কোথায়?

হিন্দু-সমাজ রক্ষায় দেবলস্মৃতি

হিন্দু-সমাজের সমূহ বিপত্তিতারণে স্মৃতিশাস্ত্রগুলির ভূমিকা কতদূর সঙ্গত, শুভকর ও সময়োপযোগী—দেবলস্মৃতি তার এক প্রামাণিক দৃষ্টান্ত। প্রাক্‌কথিত অষ্টাদশ স্মৃতি বা বিংশতি ধর্ম্ম-সংহিতায় দেবলস্মৃতির উল্লেখ নেই। সুতরাং, এটি যে অধিকতর আধুনিক তা সুনিশ্চিত। লেখকের বিচারে দেবলস্মৃতির জন্ম খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর পূর্ব্বে নয়। এক স্মরণীয় ঐতিহাসিক সঙ্কটকালে দেবলস্মৃতির বিধান হিন্দু-সমাজকে রক্ষা করেছে।

৭১১ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ বিন্ কাশিম সিন্ধু দেশ আক্রমণ করে। ইহাই ভারতের মাটিতে ইসলামের প্রথম পদক্ষেপ। সিন্ধুরাজ দাহির জেহাদী ইসলামের উন্মত্ত আক্রমণে বিধ্বস্ত, পরাজিত ও নিহত। তার পরের ঘটনা? ইতিহাস সম্বন্ধে সামান্য জ্ঞানও যাঁদের আছে

তাঁদের পক্ষে এ প্রশ্নের উত্তর দুর্ব্বোধ্য নয়। জেহাদ ইসলাম ধর্ম্মের এক অপরিহার্য্য অঙ্গ। অন্য দেশ ও অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদের উপর সশস্ত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে হনন, লুণ্ঠন, নারীধর্ষণ, আঞ্চলিক ধর্ম্মস্থানগুলির ধ্বংস সাধন এবং বলপূর্ব্বক ইসলামে ধর্ম্মান্তরিত করণ—এই জেহাদের ভীতিকর চরিত্র। জেহাদী ইসলাম মতে গণিমতের (লুণ্ঠনের) ধন পবিত্র। পরাজিত শত্রুর সাধ্বী স্ত্রীগণকে বন্দিনী ক'রে যথেচ্ছ উপভোগে দোষ নেই। আর কাফেরদের হত্যা বা বলপূর্ব্বক তাদিগকে ইসলামে আনয়নে তো অনন্ত বেহেস্তের দরজা খুলে যায়। যবন আক্রমণে সিন্ধুর হিন্দুদের ভাগ্যে এইরূপ দুর্দ্দৈবই ঘটেছিল। সিন্ধুর হিন্দুরা ছিন্নভিন্ন, দিশেহারা—বাঁচার সমস্যায় শঙ্কিত, উদ্বিগ্ন, আকুলিত। ঠিক এমনি এক যুগসঙ্কটে হিন্দুসমাজের রক্ষায় স্বধর্ম্ম দরদী দেবল যে সময়োচিত বিধান দেন, তা রক্ষণশীল সমাজে এক বৈপ্লবিক পদক্ষেপ। দেবল বচন অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যাদি দ্বিজাতি যদি ম্লেচ্ছ এবং চণ্ডালাদি দস্যুদের দ্বারা দাসরূপে পরিণত হয়, তাদের দ্বারা গবাদি পশু হত্যায় বাধ্য হয়, তারা ম্লেচ্ছদের উচ্ছিষ্ট মার্জ্জন ও উচ্ছিষ্ট ভোজনে তথা ম্লেচ্ছদের স্ত্রীদিগের সহিত সহবাসে বলপূর্ব্বক বাধ্য হয়, তবে প্রাজাপত্য বা চান্দ্রায়ণ দ্বারা ঐ হতভাগ্যেরা শুদ্ধিপ্রাপ্ত হবে। পুরুষ এবং স্ত্রী উভয়ের অনুকূলেই দেবলের এই বিধান।* ফলে ঐ কালে বহু ধর্ম্মান্তরিত পুরুষ ও নারী হিন্দু-সমাজে পুনর্বাসিত হয়ে রক্ষা পায়।

অনেকেরই বদ্ধমূল ধারণা—শুদ্ধি আন্দোলনের প্রথম প্রবর্ত্তক আর্য্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী। এই ধারণা ঠিক

---

* দাসী কৃতো বলান্ ম্লেচ্ছৈশ্চাণ্ডালাদ্যৈশ্চ দস্যুভিঃ।
অশুভং কারিতং কর্ম্ম গবাদেঃ প্রাণহিংসনম্।।
উচ্ছিষ্টমার্জ্জনঞ্চৈব তথা তস্যৈব ভক্ষণম্।
খরোষ্ট্রবিড়্ বরাহাণামামিষস্য চ ভক্ষণম্।।
তৎস্ত্রীণাঞ্চ তথা সঙ্গস্তাভিশ্চ সহভোজনম্।
মাসোষিতে দ্বিজাতৌ চ প্রাজাপত্যং বিশোধনম্।।

(মন্তব্য—দ্বিজাতি বলতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ত্রিবর্ণকেই বুঝায়। কারণ, বেদমতে ত্রিবর্ণেরই উপনয়ন বিহিত।)

নহে। দয়ানন্দের বহুপূর্ব্বে স্মৃতিকার দেবল ধর্ম্মান্তরিতদের শুদ্ধিকরণের বিধান ঘোষণা করেন। পরে আমরা দেখবো—পঞ্চদশ শতাব্দীতে বঙ্গের স্মার্ত্ত রঘুনন্দন উক্ত দেবল-বচনকে মান্যতা দান করেন এবং স্বল্প প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা ম্লেচ্ছ ও দস্যুদের দ্বারা বলপূর্ব্বক অপহৃতা, ধর্ষিতা ও উপভুক্তা নারীদের এবং ধর্ম্মান্তরিত ও দাসীকৃত পুরুষদের হিন্দুসমাজে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা দেন। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা সঙ্ঘাচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দও আপদ্ধর্ম্মরূপে এই বিধানে পূর্ণ সম্মতিদাতা। কিন্তু এ বিষয়ে তাঁর ছিল বিশিষ্ট দূরদৃষ্টি এবং গভীর সমীক্ষণ, যা অন্য সংস্কারকগণে দুর্ল্লভ। কোন আন্দোলনকেই তিনি তাৎক্ষণিক দৃষ্টিতে দেখে পরিতুষ্ট থাকেন নি—তিনি প্রবেশ করেছেন সমস্যার একেবারে গভীরে। যথাস্থানে তা আলোচিত হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বৌদ্ধ ও শাঙ্কর যুগে হিন্দু-সমাজ

বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুত্থান

শ্রীবুদ্ধের আবির্ভাব খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে। রাজকুলে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক জগতের দুঃখের চিত্র দর্শনে তিনি এতই ব্যথিত হন যে, দুঃখনিরাকরণের উপায় উদ্ভাবনে তিনি হন সংসারত্যাগী, বরণ করেন সন্ন্যাস ধর্ম্ম। কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন করেন বোধি লাভের জন্য। তৎপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্মই বৌদ্ধধর্ম্ম।

বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুত্থানে বৈদিক বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ভাঙ্গনের মুখে পড়ে। বৌদ্ধধর্ম্ম—ক্ষণিকবাদী ; চিরস্থায়ী আত্মায় বিশ্বাসী নয়, ঈশ্বর মানে না, অত্যধিক সন্ন্যাসবাদী, কিন্তু বর্ণাশ্রম মানে না। বুদ্ধেরা দুঃখবাদী। দুঃখের কারণ এবং দুঃখের নিরাকরণের কথাও তাঁরা

বলেন। তাঁদের মতে কর্ম্মই দুঃখের কারণ—জন্মান্তরের কারণ। বাসনা শেষ হলে, কর্ম্ম ফুরিয়ে গেলে নির্ব্বাণ। এই নির্ব্বাণ অর্থে শূন্য। তেল নিঃশেষ হলে প্রদীপ নিভে যায়—তারপর আর কিছুই থাকে না।

বুদ্ধ প্রচার করেছেন ধর্ম্ম—দর্শন নয়। তিনি চারিটি আর্য্যসত্য এবং আষ্টাঙ্গিক সাধনমার্গের প্রবক্তা। দুঃখ আছে ইহা এক আর্য্যসত্য, দুঃখের কারণ তৃষ্ণা ও অবিদ্যা, তৃষ্ণার নাশ হলে দুঃখের নাশ ও জন্মমৃত্যুর প্রবাহের নিবৃত্তি বা নির্ব্বাণ। এই নির্ব্বাণের সাধনমার্গ অষ্টবিধ—সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সঙ্কল্প, সম্যক্ বাক্য, সম্যক্ কর্ম্মান্ত, সম্যক্ ব্যায়াম, সম্যক্ স্মৃতি এবং সম্যক্ সমাধি। সংক্ষেপতঃ প্রজ্ঞা, সমাধি ও শীল—জ্ঞান, ধ্যান ও চরিত্র—এই হলো বৌদ্ধধর্ম্মের সার কথা। ত্যাগ, অহিংসা, সাম্য, সেবা, ব্রহ্মচর্য্যাদি চরিত্রনীতির উপর বিশেষ গুরুত্ব দেন শ্রীবুদ্ধ। তিনি নিজে দার্শনিক প্রশ্নের উত্তর বড় দিতেন না। বুদ্ধের পরে বুদ্ধিমান বৌদ্ধরা যে দার্শনিক মত প্রতিষ্ঠা করেন, তাহাই বৌদ্ধদর্শন নামে খ্যাত। এই দর্শনে যুক্তির প্রাখর্য্য ছিল, কিন্তু ফলশ্রুতি—শূন্যে। পরে এই ধর্ম্মে ভাঙ্গন ধরে—হীনযান ও মহাযান দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে যায়। ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের একত্র অবস্থান পরবর্ত্তী কালে বৌদ্ধতান্ত্রিকতার জন্ম দেয়। ওঁরা নিজেরাই নিজেদের মৃত্যুর কবর তৈরী করেন। কিন্তু ইতিহাস এই যে, অন্তত হাজার বৎসর ভারতে বৌদ্ধধর্ম্ম দাপিয়ে বেড়িয়েছে। সম্রাট অশোকের পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতের বাহিরে চীন, জাপান, ব্রহ্ম, শ্যাম, তিব্বত, লঙ্কা প্রভৃতি দেশেও বৌদ্ধধর্ম্ম বহু বিস্তৃতি লাভ করে। কিন্তু সনাতনীদের সহিত সঙ্ঘাতে শেষ পর্য্যন্ত এই ধর্ম্মকে ভারত থেকে বিদায় নিতে হয়।

উল্লেখ করা কর্ত্তব্য যে, বৌদ্ধধর্ম্ম ও বৌদ্ধদর্শন সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আমাদের বর্ত্তমান নিবন্ধে প্রাসঙ্গিক নয়। আমাদের জানা ভাল, বেদধর্ম্মের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে ভারতে আপন স্বাধীন বিচারসত্তায় যে ধর্ম্মের অভ্যুত্থান ঘটেছিল, তার অনিবার্য্য প্রভাব থেকে বঙ্গ-সমাজও নিষ্কৃতি পায় নি। সেন রাজগণের আবির্ভাবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত

বঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। বৌদ্ধপ্লাবিত ও বামাচারী তান্ত্রিকদের কামাচারে কলুষিত বাংলার এমন দুর্নাম রটেছিল যে, তীর্থদর্শন ব্যতীত এ দেশে এলে তা প্রায়শ্চিত্তযোগ্য অপরাধ।

আচার্য্য শঙ্কর ও বৌদ্ধপ্রভাব নিরসন

আচার্য্য শঙ্করের আবির্ভাব খৃষ্টীয় ৭৮৮ শতাব্দীতে। কেবলাদ্বৈতবাদী, বেদান্তকেশরী, শিবাবতার আচার্য্য শঙ্কর ভারতের বৌদ্ধপ্রভাব নিরাকরণপূর্ব্বক বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠাতা। বেদের যাগ-যজ্ঞাদি কর্ম্মকাণ্ডের প্রবক্তা তিনি নহেন, তিনি মুখ্যতঃ জ্ঞানকাণ্ডের উপাসক। এই যুগাবতার শাস্ত্রবৈদগ্ধ্যের খর তরবারি হস্তে পরিভ্রমণ করেন ভারতের প্রান্তে প্রান্তে এবং যুক্তি ও বিচার দ্বারা বৌদ্ধমত খণ্ড খণ্ড করেন। শূন্যবাদ শূন্যে বিলীন হয়, নির্ব্বাণের সঙ্গত অর্থ দাঁড়ায় সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমব্রহ্মে এক হয়ে যাওয়া। এমন প্রবাদ আছে, আচার্য্যের বেদান্ত-দুন্দুভি-নিনাদ যতদূর পর্য্যন্ত যায় ততদূর পর্য্যন্ত বৌদ্ধরা ফিরে আসে সনাতন বেদধর্ম্মে। শূন্যের কি কোন অর্থ হয়? আর নীতিবাদ ও চরিত্র-গৌরবের কথা? বেদ-বেদান্ত, পুরাণ-মহাকাব্য, ধর্ম্মসংহিতাদি গ্রন্থে যে চরিত্রনীতির অমিত উপাদান বিদ্যমান, তার বাইরে বৌদ্ধধর্ম্ম কি নূতন কিছু দিতে পেরেছে? খৃষ্টীয় নবম শতাব্দী থেকেই বৌদ্ধধর্ম্ম নিষ্প্রভ হতে আরম্ভ করে, তারপরে একেবারে নিভে যায়। ক্ষণিকবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত যে দর্শন, সাময়িক চমক সৃষ্টি-পূর্ব্বক তা সময়েই মিলিয়ে যায়। অবশ্য ভারতের বাহিরে চীন, জাপান, ব্রহ্ম, লঙ্কাদি রাজ্যে অদ্যাপি বৌদ্ধধর্ম্ম বিদ্যমান এবং ভারত পৃথিবীর সমুদয় বৌদ্ধদের তীর্থক্ষেত্র। ভারতে বৌদ্ধ ও সনাতনীদের ভিতরে সঙ্ঘাত ঘটেছিল ঠিকই, আবার অবশেষে একটা সমন্বয়সাধক আপসও হয়, শ্রীবুদ্ধ স্থান লাভ করেন হিন্দুর দশাবতারের তালিকায়।

বুদ্ধ, সঙ্ঘ ও ধর্ম্ম—বৌদ্ধদের ত্রিশরণ এই সম্প্রদায়কে দিগ্বিজয়ী ক'রে তুলেছিল। বুদ্ধ মিলিয়ে গেলেন হিন্দুর অবতার-পরম্পরায়, আর ধর্ম্ম তো ভারতের চিরন্তন সম্পৎ। কিন্তু বৌদ্ধদের ছিল এক

বিশেষ বৈশিষ্ট্য, তা হলো সঙ্ঘচেতনা ও সঙ্ঘসাধনা। তাৎকালিক হিন্দুরা তা নিতে পারে নি। আচার্য্য শঙ্করাদি যুগপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষেরাও তা হিন্দুকে ধরিয়ে দেন নি। ঊনবিংশ শতাব্দীতে স্বামী বিবেকানন্দ এই সঙ্ঘতত্ত্ব উপলব্ধি ক'রেই বোধহয় বলেছিলেন —"Vedantic brain in an Islamic body." অর্থাৎ, হিন্দুসমাজের দেহটা হবে মুসলমানের ন্যায় এককাট্টা, কিন্তু মস্তিষ্কটা হবে বেদান্তধর্ম্মী। কোন কোন গোঁড়া মুসলমান স্বামী বিবেকানন্দের উক্ত বাণীর অপব্যাখ্যার সুযোগ ছাড়েন নি। বাংলা দেশের এক মৌলবাদী পত্রিকা লিখেন—"হিন্দুধর্ম্ম পূর্ণাঙ্গ নয়। হিন্দুধর্ম্মকে পূর্ণাঙ্গতা লাভ করতে হলে ইসলাম গ্রহণ করতে হবে—স্বামী বিবেকানন্দের অভিপ্রায়।" এই হাস্যকর মন্তব্যের উপযুক্ত উত্তর সঙ্ঘের প্রণব পত্রিকার সম্পাদকীয়তে যথা সময়ে প্রকাশিত হয়েছিল।

স্বামী বিবেকানন্দজীর বোধহয় স্মরণে ছিল না যে, সঙ্ঘবদ্ধতা শিক্ষার জন্য ভারতকে মক্কা, মদিনার দিকে তাকাতে হবে না। সঙ্ঘসাধনার দৃষ্টান্ত আমাদের ঘরেই আছে এবং সেটি ধরা পড়ে তাঁরই উত্তরসূরী যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তক স্বামী প্রণবানন্দের দিব্য আর্ষ দৃষ্টিতে। তদীয় উক্তি—"সেই বৈদিক যুগের আদর্শ ও বৌদ্ধযুগের বিশিষ্ট ভাব লইয়া সঙ্ঘসন্তানদিগকে সমগ্র দেশের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া দেশবাসীকে সঙ্ঘের ভাবে অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে।" আবার বলেন—"বুদ্ধের পর সঙ্ঘ কি জিনিস তা মানুষ জানে না। আমার সঙ্ঘ হবে দ্বিতীয় বুদ্ধের সঙ্ঘ।" অর্থাৎ, তিনি বেদধর্ম্মভিত্তিক সঙ্ঘগঠনের প্রবক্তা। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের উপসংহার মন্ত্রে তো সঙ্ঘসাধনার বলিষ্ঠ বাণীই উপদিষ্ট। "সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্" ইত্যাদি। সর্ব্বযুগে সঙ্ঘবদ্ধতাই অপরাজেয়া শক্তির উৎস। স্বামী প্রণবানন্দ শতধা বিচ্ছিন্ন হিন্দুর ভিতরে অখণ্ড সঙ্ঘচেতনা সঞ্চারের সঙ্কল্পে বাস্তব কর্ম্মধারার প্রবর্ত্তক। তা আমরা যথা সময়ে দেখবো।

তৃতীয় অধ্যায়

পালযুগ ও সেনযুগে হিন্দু-সমাজ

পালযুগের কথা

ইতিহাস বলেন—দিগ্বিজয়ী শশাঙ্কের মৃত্যুর পর প্রায় একশত বৎসর বঙ্গে কোন শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসন ছিল না। বঙ্গদেশ খণ্ড খণ্ড সামন্তরাজ্যে বিভক্ত এবং একের সহিত অন্যের রক্তাক্ত বিবাদ। ফলে বঙ্গে চলছিল এক ঘোর অরাজকতা—যাকে বলা হয় মাৎস্যন্যায়। আমরা পূর্ব্বেই বলেছি—অরাজকতাও সমাজ-বিবর্ত্তনের অন্যতম কারণ। সুতরাং, বক্ষ্যমাণ কালে বঙ্গের সমাজ-জীবনেও ছিল না কোন সৌন্দর্য্য, সুস্থিতি ও শৃঙ্খলা। এই অরাজকতার অবসান ঘটে পালবংশের অভ্যুত্থানে। দেশের কতিপয় প্রবীণ সামন্ত ও প্রজারাই দেশের কল্যাণে গোপাল নামে এক যোগ্য সামন্তকে রাজপদে বরণ করেন। বাংলায় ফিরে আসে সুশাসন। গোপালের পুত্র ধর্ম্মপাল এক স্বনামধন্য ব্যক্তি। তিনি দক্ষ যোদ্ধা, সফল রাজনীতিজ্ঞ ও যোগ্য প্রশাসক। তিনি শুধু বঙ্গ দেশেই রাজনৈতিক সুস্থিতি ফিরিয়ে এনেছিলেন তা নয়, বঙ্গের বাহিরেও তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেন নিজ বাহুবলে। ধর্ম্মপালের পরবর্ত্তী নৃপতিরাও এই গৌরব অক্ষুণ্ন রাখেন এবং পালরাজ্য পরিণত হয় পাল সাম্রাজ্যে। অতঃপর পালবংশের গৌরব কখনো পড়েছে এবং আবার কখনো উঠেছে। এই উত্থান-পতনের ভিতর দিয়েও পালশাসন স্থায়িত্ব লাভ করে অন্যূন চারিশত বর্ষ।

আমাদের মুখ্য আলোচ্য যুগে যুগে সমাজ-বিবর্ত্তন। বিদ্বান্ ঐতিহাসিকেরা বলেন—সম্রাট অশোকের সময়েই বঙ্গ দেশেও বৌদ্ধধর্ম্ম প্রসারিত হয়। ৯৮০ খৃষ্টাব্দে আবির্ভূত এবং নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্ঘস্থবির (সর্ব্বাধ্যক্ষ) তথা বৌদ্ধশাস্ত্রে অগাধ পণ্ডিত দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ছিলেন ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের সন্তান। আচার্য্য

শঙ্কর বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব বহুলাংশেই ম্লান করতে সমর্থ হন। কিন্তু পাল-সাম্রাজ্যে পুনরায় তার নব অভ্যুত্থান। কারণ, পালরাজগণ ছিলেন বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। বঙ্গ, বিহার সমেত যতদূর পর্য্যন্ত তাঁদের রাজ্যবিস্তার হয় ততদূর পর্য্যন্ত ভূখণ্ডে বৌদ্ধধর্ম্ম আবার নবজীবনে উজ্জীবিত হবে তা স্বাভাবিক। পাল-রাজগণ হিন্দুধর্ম্মের প্রতি বিরূপ ছিলেন না। তথাপি, অশোকের রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় যেমনটি ঘটেছিল, পালরাজগণের পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থানও তেমনি স্বাভাবিক ঘটনা। বাংলার বহু হিন্দু তৎকালে বৌদ্ধধর্ম্মাশ্রিত। পাল আমলে রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটেছিল উল্লেখযোগ্য ভাবেই। কিন্তু বৌদ্ধপ্লাবনে হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজ কিছু বিপর্য্যস্ত হবে, তা অস্বীকার্য্য নয়।

সেন যুগ

পালবংশের পতনের পর বঙ্গদেশে সেন রাজগণের আগমন। (১১২৫-৫৮)। এই বংশের প্রথম স্বাধীন রাজা বিজয় সেন। বিজয় সেনের পুত্র বল্লাল সেনের প্রসিদ্ধি সর্ব্বজনবিদিত। তিনি বিদ্যোৎসাহী, দক্ষ প্রশাসক ও সমাজ-সংস্কারক। সামরিক শক্তি বলে তিনিও সমগ্র বঙ্গদেশ এবং বিহারের কিছু অংশ স্বকীয় অধিকারে আনয়নে সমর্থ হন। তাঁর রাজ্যটি পাঁচটি অঞ্চলে বিভক্ত ছিল—রাঢ়, বরেন্দ্র, বাগড়ি, বঙ্গ (পূর্ব্ববঙ্গ) ও মিথিলা (উত্তর বিহার)। মূল রাজধানী ছিল নবদ্বীপে। কিন্তু শাসনকার্য্যের সুবিধার্থে রামপাল ও গৌড়েও দুটি রাজধানী ছিল। গুরু অনিরুদ্ধের নিকট তিনি শৈবধর্ম্মে দীক্ষিত। গুরুর আদেশে বল্লাল বৌদ্ধধর্ম্মকে নিরস্ত ক'রে বঙ্গে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠাতা। তিনি নিজেও সর্ব্বদা যাগ-যজ্ঞাদি ধর্ম্মকর্ম্মে নিরত রইতেন। দানসাগর, অদ্ভুতসাগর, প্রতিষ্ঠা-সাগর ও আচার-সাগর গ্রন্থচতুষ্টয় বল্লালের পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক।

বল্লাল সেন ও কৌলীন্য প্রথা

বঙ্গে কৌলীন্য প্রথার প্রবর্ত্তকরূপে বল্লালের খ্যাতি সর্ব্বজনস্বীকৃত।

তিনি ব্রাহ্মণ, বৈদ্য এবং কায়স্থদের ভিতরে আচার-ব্যবহারের কলুষ লক্ষ্য পূর্ব্বক সদাচারে উৎসাহ দিতেই কৌলীন্য বিতরণ করেন। কিন্তু সকল ব্রাহ্মণ, বৈদ্য বা কায়স্থই কৌলীন্য পান নি। আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, সদ্বৃত্তি, তপস্যা ও দান —এই নয়টি গুণ যাঁদের ভিতরে দেখেছেন তাঁদিগকেই মাত্র কৌলীন্য দিয়েছেন।* লেখকের মতে কৌলীন্য আসলে গুণের সমাদর—রাজসম্মান। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে এই কৌলীন্য গুণগত না হয়ে বংশগত হয়ে দাঁড়ায়। তখনই সৃষ্টি হয় নূতন জটিলতার।

সম্বন্ধ নির্ণয় গ্রন্থে প্রকাশ যে, বেলা এক প্রহরের মধ্যে যে সকল ব্রাহ্মণ বল্লালের সভায় এসেছিলেন, তাঁদিগকে তিনি কৌলীন্য দেন নি। দেড় প্রহরের পর ও দ্বিপ্রহরের মধ্যে আগত ব্রাহ্মণেরা মুখ্য কৌলীন্য পান। যুক্তি এই—যাঁরা বিলম্বে এসেছিলেন তাঁরা সন্ধ্যাবন্দনাদি উপাসনায় অধিক সময় অতিবাহিত করেছেন। অতএব তাঁদের ভিতরেই বৈদিক আচার অধিক। ধরাশূর ২২ গাঞী ব্রাহ্মণকে কুলীন গণ্য করেছিলেন। বল্লাল তার ভিতরে মাত্র ৮ গাঞী ব্রাহ্মণকে মুখ্য কুলীন এবং অবশিষ্ট ১৪ গাঞী ব্রাহ্মণকে গৌণ কুলীন করেন। আবার দোষগুণ বিচারপূর্ব্বক শ্রোত্রিয়গণের ভিতরেও দুই ভাগ —শুদ্ধ শ্রোত্রিয় ও কষ্টশ্রোত্রিয়। অর্থাৎ, কৌলীন্যেও রয়ে গেল উচ্চাবচ ভেদের অঙ্কুর এবং অপ্রাপ্তকৌলীন্য ব্রাহ্মণাদির ভিতরে খেদ ও ক্ষোভ। কিন্তু সকলকে কৌলীন্য না দিলেও গুরু অনিরুদ্ধের প্রভাবে বল্লাল ব্রাহ্মণ মাত্রকেই বর্ণশ্রেষ্ঠ রূপে মান্যতা দিয়েছেন। মনুর বচনে আছে—"ব্রাহ্মণো জায়মানো হি পৃথিব্যামধিজায়তে।" জন্মেই ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম ফিরে এলো, কিন্তু হিন্দুদের সংগঠন হলো কই?

বল্লালের পর কুলীনদের অবস্থান্তর। উচ্চ আদর্শ ও নীতিকে অক্ষুণ্ণ রাখা কি সহজ কর্ম্ম? ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার তৎপ্রণীত

* আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্।
নিষ্ঠাবৃত্তিস্তপোদানং নবধা কুললক্ষণম্।।

—কুলীনকুলসর্ব্বস্য

"বঙ্গীয় কুলশাস্ত্র" গ্রন্থে লিখেছেন—"বল্লাল সেন বাছা বাছা রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের 'কুলীন' ব'লে ঘোষণা করার পরে কুলীনদের মধ্যে কালক্রমে কতকগুলি বিবর্ত্তন সংঘটিত হয়; বল্লাল সেনের পুত্র লক্ষ্মণ সেন এই নিয়ম করেন যে, কুলীন যে ঘরে কন্যার বিবাহ দেবেন সেই ঘর থেকে তাঁকে কন্যা গ্রহণও করতে হবে; এরই নাম বংশ পরিবর্ত্ত। এর পর রাঢ়ী ব্রাহ্মণদের মধ্যে এই প্রথা চালু হয় যে, কুলীনদের মধ্যে যে উচ্চ ও নীচ কুলে আদান-প্রদান করেছে, তা নির্ণয় ক'রে সেই অনুসারে কুলীনদের পদমর্য্যাদার সমতা স্থির করা হবে; এর নাম সমীকরণ। এই সমীকরণপ্রথা প্রায় তিনশো বছর চালু ছিল এবং মোট ১১৭টি সমীকরণ হয়েছিল; অতঃপর দেবীবর ঘটক নামে জনৈক কুলাচার্য্য দেখলেন যে, কুলীনদের মধ্যে কেউ আজ নির্দ্দোষ নেই; তাই অধিক দোষাশ্রিত কুলীনদের নিষ্কুল ক'রে অল্প দোষাশ্রিত কুলীনদের 'মেল বন্ধন' করলেন।"

দেবীবর ঘটকের বিস্তৃত বিবরণে পরে আসবো। একটা বিষয় লক্ষ্য করার যে, সর্ব্বশ্রেণীর হিন্দুদের সমন্বিত করার প্রচেষ্টা কি বল্লাল, কি লক্ষ্মণ সেন, কি দেবীবর ঘটক—কারো ভিতরেই দেখা যায় নি। বাংলায় বৌদ্ধধর্ম্ম নিরস্ত ক'রে সেই সকল বৌদ্ধকে হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দু-সমাজের মূল স্রোতে আনয়নের কোন প্রচেষ্টা বল্লাল সেন করেছিলেন কি না তার বিবরণও ইতিহাসে দুর্ল্লভ। সেই সকল নিষিদ্ধ বৌদ্ধদের ভবিষ্যৎ কিরূপে নির্দ্দিষ্ট হয়েছিল, সে প্রশ্নের উত্তরও দাবী করা যেতে পারে। বল্লালের কৌলীন্য বিতরণের ভিতরেও কারো প্রতি অনুগ্রহ এবং কারো প্রতি নিগ্রহের গন্ধ পাওয়া যায়। ফলতঃ যুগবিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুসমাজেও নানা জটিলতা বেড়েই চলে। ধর্ম্ম-কর্ম্ম সম্পাদনের কাল ও বিধি সম্বন্ধেও বিতর্ক ও সংশয় দেখা দেয়। লক্ষ্মণ সেনের সময়েই তুর্কী বখ্‌তিয়ার খিলজী (১১৯৯) নদীয়া ও গৌড় জয় ক'রে সেন-সাম্রাজ্যের পতন ঘটায়। পরে ক্রমে ক্রমে সমগ্র বঙ্গই হয় ইসলাম-কবলিত। ফলে হিন্দুর সহিত যবন-সম্পর্ক এত বেশী ঘটতে থাকে যে তা এক নূতন

সমস্যার সৃষ্টি করে। বিবাহ, প্রায়শ্চিত্ত, সম্পত্তির অধিকার, সামাজিক ব্যবহার বিধি প্রভৃতিতে এমন বহু অমীমাংসিত বিষয় উপস্থিত হয়, যার আশু সমাধান অত্যাবশ্যক। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে এ রকমই এক পরিস্থিতির উদ্ভব। সেই সময়েই আবির্ভাব রঘুনন্দনের।

চতুর্থ অধ্যায়

স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ও হিন্দু-সমাজ

বাংলার নবাব তখন হোসেন শাহ। অর্থাৎ, পালরাজ ও সেনরাজগণের পতনে বঙ্গের হিন্দুদের হাতে মূলতঃ রাজশক্তি আর নেই। বঙ্গদেশ পুরোপুরি ইসলামের অধীন। তৎসত্ত্বেও নবদ্বীপ তখন একাধিক খ্যাতিমান মনীষীর জন্ম দিয়েছে। সুপণ্ডিত নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি, তন্ত্রসিদ্ধ সাধক কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ , প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য এবং আমাদের আলোচ্য স্মার্ত্ত রঘুনন্দন নবদ্বীপের সন্তান এবং জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ ভেদ সত্ত্বেও সকলেই সামসময়িক।

অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব

নবদ্বীপের গয়ঘর বন্দ্যঘটীয় মেলে সর্ব্বশাস্ত্রবিদ্ স্মার্ত্ত পণ্ডিত রঘুনন্দনের জন্ম। ইনি খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। রঘুনাথ শিরোমণি যখন ন্যায়শাস্ত্রের জটিল তর্কে অনবসর, তৎকালে রঘুনন্দন বাংলার সমাজ-চিন্তায় একান্ত আত্মনিবেদিত। হিন্দুসমাজের তাৎকালিক বিপর্য্যয় লক্ষ্যপূর্ব্বক আপাতবিরোধী ও বিতর্কিত মতগুলির সম্যক্ বিচার ক'রে গ্রহণযোগ্য ও সময়োপযোগী সামাজিক বিধান প্রবর্ত্তন তাঁর অবিস্মরণীয়া কীর্ত্তি। তিনি নানা সংহিতা, স্মৃতি, পুরাণ, কল্পসূত্র, দর্শন, মহাভারত, জ্যোতিষশাস্ত্র মন্থনপূর্ব্বক "অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব" গ্রন্থের রচয়িতা। স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের

কর্ম্মের পরিধি কত ব্যাপক ও অত্যাবশ্যক ছিল, তা তদীয় অষ্টাবিংশতি তত্ত্বের বিশ্লেষণে অনুমিত। এই অষ্টাবিংশতি তত্ত্বে আছে, (১) মলমাসতত্ত্ব, (২) দায়তত্ত্ব, (৩) সংস্কারতত্ত্ব (দশবিধ সংস্কার), (৪) শুদ্ধিতত্ত্ব (মৃত্যু ও জন্মজন্য অশৌচ), (৫) প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব, (৬) উদ্বাহতত্ত্ব (বিবাহ), (৭) তিথিতত্ত্ব, (৮) জন্মাষ্টমীতত্ত্ব, (৯) দুর্গোৎসবতত্ত্ব, (১০) ব্যবহারতত্ত্ব (বিচার ও আইনকানুন), (১১) একাদশীতত্ত্ব, (১২) তড়াগোৎসব-তত্ত্ব (জলাশয়াদি খননের কাল ও পুণ্যফল), (১৩) মঠপ্রতিষ্ঠা-তত্ত্ব (১৪–১৬) ত্রিবেদীয়দের বৃষোৎসর্গ-তত্ত্ব, (১৭) ব্রততত্ত্ব, (১৮) দেবপ্রতিষ্ঠা-তত্ত্ব, (১৯) দিব্যতত্ত্ব (বিচার প্রভৃতিতে দৈব প্রমাণ এবং দিব্য বিষয়ে নানাবিধ বিধি-নিষেধ), (২০) জ্যোতিস্তত্ত্ব, (২১) বাস্তুযাগ-তত্ত্ব, (২২) দীক্ষাতত্ত্ব, (২৩) আহ্নিক-তত্ত্ব, (২৪) কৃত্যতত্ত্ব (কোন্ তিথিতে কি করণীয়), (২৫) শ্রীপুরুষোত্তম-তত্ত্ব (ঐ দর্শনবিধান প্রভৃতি), (২৬) সামবেদীয়দের শ্রাদ্ধতত্ত্ব, (২৭) যজুর্ব্বেদীয়দের শ্রাদ্ধতত্ত্ব এবং (২৮) শূদ্রকৃত্যবিচার-তত্ত্ব। এই তালিকা থেকেই বুঝা যায় যে, রঘুনন্দনের আগে ও পরে সমাজ সংস্কারের ঈদৃশ সর্ব্বগ্রাসী প্রয়াস আর কারো ভিতরে দেখা যায় নি। তথ্যের প্রামাণিকতায় এবং যুক্তির প্রাখর্য্যে তিনি নব্য স্মৃতিকাররূপে পরিচিত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাঙ্গালী হিন্দু রঘুনন্দনের বিধান মেনেই আজ অবধি ধর্ম্ম-কর্ম্ম উদযাপন ক'রে আসছে।

রঘুনন্দনের উদারতা

"সমাজ-সংস্কারক রঘুনন্দন" শীর্ষক গবেষণা গ্রন্থে ডঃ বাণী চক্রবর্ত্তী রঘুনন্দনে প্রগতিশীলতা ও রক্ষণশীলতা উভয়েরই সহাবস্থান দেখেছেন। স্থান, কাল ও পরিস্থিতি বিচারে কোথাও তিনি অতি উদার, কোথাও অসম্ভব কঠোর। আমরা পূর্ব্বেই দেখেছি, তিনি ম্লেচ্ছ ও চণ্ডাল দস্যুকর্ত্তৃক ধর্ষিতা, অপহৃতা ও উপভুক্তা নারীকে এবং বলপূর্ব্বক ধর্ম্মান্তরিত ও দাসীকৃত মানুষকে স্বল্প প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা সমাজে পুনর্গ্রহণের পক্ষপাতী। এ বিষয়ে তিনি

দেবলবচনকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করেছেন। (দেবলবচন প্রথম অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য) এ বিষয়ে পরাশর সংহিতার বিধানও অতীব উদার। স্ত্রী ও ভূমি—দু-ই একরূপ; সুতরাং তা চিরদিনের জন্য দূষণীয়া হয় না। বন্দিনী করে, প্রাণহত্যার ভয় দেখিয়ে, হাত-পা বেঁধে বলপূর্ব্বক উপভুক্তা নারী কৃচ্ছ্র সান্তপন ব্রতাচরণ করলেই শুদ্ধি লাভ করবে।[১] রঘুনন্দনের বিচারে জ্ঞানকৃত ব্যভিচার ক্ষমার অযোগ্য, তার প্রায়শ্চিত্তও যথেষ্ট নয়। এরূপ জ্ঞানপাপীকে হীন চক্ষে দেখবে, 'এক ঘরে' ক'রে রাখবে, কেউ তার সঙ্গে মেলামেশা করবে না। এক্ষেত্রে পরাশর কিন্তু আরো উদার। তাঁর মতে 'সকৃদ্ভুক্তা যা নারী নেচ্ছন্তী পাপকর্ম্মভিঃ। প্রাজাপত্যেন শুধ্যেত ঋতুপ্রস্রবণেন তু।। পঃ সং ১০।২৬। অর্থাৎ, কোন নারী ইচ্ছাপূর্ব্বক পরপুরুষের সংসর্গ ক'রেও যদি অনুতপ্ত হয় যে, আর এরূপ পাপকর্ম্ম করবে না, তবে সে প্রাজাপত্য এবং পুনর্ব্বার ঋতুমতী হয়ে শুদ্ধ হবে।

সুরাপান ব্রাহ্মণের নিষিদ্ধ। তবে প্রাণরক্ষার জন্য সুরাযুক্ত ঔষধ সেবনে দোষ নেই। এমন কি চিকিৎসার উদ্দেশ্য নিষিদ্ধ ম্লেচ্ছদেশে গমন এবং নিষিদ্ধ ভোজনও চলতে পারে। রোগী সুস্থ হলে স্বল্প প্রায়শ্চিত্ত বিধেয়। রঘুনন্দন কিন্তু শূদ্রের সুরাপান নিষিদ্ধ করেন নি।

সিদ্ধতণ্ডুল ও মসূরির ডাল ভক্ষণে রঘুনন্দনের নিষেধ নেই। তবে হবিষ্যান্নে ও দেবভোগে আতপ তণ্ডুল অপরিহার্য্য। ব্রাহ্মণ-শূদ্র নির্ব্বিশেষে সকলকে মৎস্য-মাংস আহারে অনুমতি দিয়ে তিনি মৎস্যপ্রিয় বাঙ্গালীকে পরিতুষ্ট করেছেন। এ সকল ক্ষেত্রেও তিনি উদার। তান্ত্রিক বামাচার ন্যক্কারজনক, কিন্তু বাঙ্গালীর উপর বিশুদ্ধ

---

(১) পরাশর সংহিতা—

চাতুর্ব্বর্ণ্যস্য নারীণাং কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়নব্রতম্।
যথা ভূমিস্তথা নারী তস্মাৎ তাং ন তু দূষয়েৎ।।১০।২৪
বন্দিগ্রাহেণ যা ভুক্ত্বা হত্বা বদ্ধা বলাদ্ভয়াৎ।
কৃত্বা সান্তপনং কৃচ্ছ্র শুধ্যেত পরাশরোহব্রবীৎ।।১০।২৫

তন্ত্রের প্রভাব অনস্বীকার্য্য। বিশেষতঃ তাঁর সময়েই তন্ত্রসিদ্ধ মহাত্মা আগমবাগীশ বামাচারের জঞ্জাল থেকে মুক্ত ক'রে তন্ত্রের বিশুদ্ধ রূপটি জনসমক্ষে তুলে ধরেন তদ্বিরচিত "বৃহৎ তন্ত্রসার" নামক বিখ্যাত গ্রন্থে। রঘুনন্দন তন্ত্রের এই প্রভাব অত্যন্ত অস্বীকার করতে পারেন নি। তন্ত্রকেও প্রমাণরূপে গ্রহণ করেছেন। তান্ত্রিকী দীক্ষা তিনি স্বীকার করেন।

বাল্য বিবাহের সমর্থন

রঘুনন্দন বাল্য বিবাহের সমর্থক। কন্যা ৮ বৎসরে গৌরী, ৯ বৎসরে রোহিণী, ১০ বৎসরে কন্যকা। তার পরেই কন্যার পরিচয় রজস্বলা। ১০ বৎসরের মধ্যেই কন্যার বিবাহ দান অবশ্য কর্ত্তব্য।[২] ১২ বৎসরেও বিবাহ না দিলে কন্যার স্বাধীনতা আছে নিজ পছন্দমত গম্য বরকে স্বয়ং বরণ করার। সম্প্রদানের কোন অভিভাবক না থাকলে কন্যা নিজেই সম্প্রদত্তা হতে পারবে। রঘুনন্দন নির্গুণ বরে কন্যাদানের বিরোধী। তাতে কন্যার দুঃখই বাড়ে।

বিবাহের বয়ঃসীমার প্রশ্নের মনু ও রঘুনন্দনে কিছু মতপার্থক্য দেখা যায়। মনু বলেন—"ত্রিশংদ্বর্ষঃ ষোড়শবর্ষাং ভার্য্যাং বিন্দেত নগ্নিকাম্।" ত্রিশ বৎসরের পুরুষ ষোল বছরের নগ্নিকা বা অনাবর্ত্তা বা অরজস্বলা কন্যাকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করবে। উভয়েই কিন্তু রজস্বলা হওয়ার পূর্ব্বেই কন্যার বিবাহ দানের পক্ষপাতী। মনুর সময়ের নৈতিক পরিবেশে হয়তো মানুষের জৈবী প্রবৃত্তির উন্মেষে বিলম্ব হতো—রঘুনন্দনের সময়ে ঘটে তার অপভ্রংশ।

---

(২) অষ্টবর্ষা ভবেদ্ গৌরী নববর্ষা চ রোহিণী।
দশমে কন্যকা প্রোক্তা অতঃ উর্দ্ধ্বং রজস্বলা।।
তস্মাৎ সংবৎসরে প্রাপ্তে দশমে কন্যকা বুধৈঃ।
প্রদাতব্যা প্রযত্নেন ন দোষ কালদোষজঃ।।

সহমরণ নয়—বিধবার ব্রহ্মচর্য্য

হিন্দুবিধবার সহমরণ প্রসঙ্গে রঘুনন্দন অঙ্গিরার বচন উদ্ধৃত করেন। অঙ্গিরা বলেছেন—"মৃতে ভর্তরি যা নারী সমারোহেদ্ধুতাশনম্। সারুন্ধতী-সমাচারা স্বর্গলোকে মহীয়তে।।"* অর্থাৎ, স্বামীর মৃত্যুতে যে নারী অগ্নিতে সহমৃতা হয়, সেই সতী অরুন্ধতীর সমান স্বর্গলোকে মহীয়সী। রঘুনন্দন সম্ভবতঃ মনে করেন পতিব্রত্য ধর্ম্মের প্রশংসার জন্যই এই বচন। সহমরণ বাধ্যতামূলক নয়। বিধবার ব্রহ্মচর্যব্রত পালনই বাঞ্ছনীয়। বিধবা হবে বিলাসত্যাগিনী, ব্রতচারিণী, একাদশী প্রভৃতি বিশেষ তিথিতে উপবাসকারিণী। কিন্তু বিধবার পুনর্বিবাহ কদাচ নয়।

আত্মহত্যাকারীর সম্বন্ধে রঘুনন্দনের অভিমত অতি কঠোর। আত্মহত্যাকারীর দেহের কোন সংকার নেই। তার শরীর পশুর ন্যায় জঙ্গলে ফেলে দিবে। তার কোন শ্রাদ্ধক্রিয়াও নেই। এ ক্ষেত্রে কিন্তু বিহার ও উত্তরপ্রদেশে প্রচলিত যাজ্ঞবল্ক্য-মত, উড়িষ্যা ও মাদ্রাজের উৎকল-মত এবং আসামে প্রচলিত গদাধর-মত অত্যন্ত উদার। এ সকল মতে আত্মহত্যাকারীর দাহ ও শ্রাদ্ধ বিহিত। নূতন নূতন ব্যাখ্যার কৌশলেই গৌড়ীয় স্মৃতি, মৈথিল স্মৃতি, আসাম স্মৃতি ও উৎকল স্মৃতির নিবন্ধাবলীর উৎপত্তি।

স্ত্রী-আচার অনুমোদন

রঘুনন্দন শাস্ত্রীয় কৃত্য মেনেও বিবাহাদিতে স্ত্রী-আচারে উৎসাহদাতা। রঘুনন্দনের বিধানে বিবাহ, মহোৎসব ও মঙ্গলজনক সকল কার্য্যে মহিলাদের হুলুধ্বনি বিধেয়। "মহোৎসবে চ মাঙ্গল্যে তত্র স্ত্রীণাং ধ্বনিঃ শুভঃ। ধ্বনিঃ হুলুহুলু ধ্বনিঃ।" পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামে এই ধ্বনিকে বলা হয়—জোকার। সম্ভবতঃ এই শব্দটি 'জয়কার'

---

* মৃতে ভর্তরি যা নারী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।
সা মৃতা লভতে স্বর্গং যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ।

পরাশর, ৪।২৭

শব্দের অপভ্রংশ। এই ধ্বনিতে উৎসবে আবেগ ও প্রাণসঞ্চার হয়।

বিতর্কিত বিষয়ের মীমাংসা

জন্মাষ্টমী উৎসব শ্রাবণে? না, ভাদ্রে? দুই পুরাণের দুই মত। ব্রহ্মপুরাণ মতে ভাদ্র মাসের কৃষ্ণাষ্টমী রাত্রে জন্মাষ্টমীব্রত পালনীয়। বিষ্ণুপুরাণ মতে—শ্রাবণী কৃষ্ণাষ্টমীতে। এই বিরোধের মীমাংসা কি? রঘুনন্দন বলেন—গৌণচান্দ্র অনুসারে গণনায় ভাদ্র মাসই হয়। কিন্তু মুখ্যচান্দ্র মতে শ্রাবণী কৃষ্ণাষ্টমী। সর্ব্বপ্রকার ব্রতোৎসব, পূজা, পার্ব্বণে রঘুনন্দন মুখ্য চান্দ্র মাসকেই বিহিত ব'লে মনে করেন। অদ্যাপি বাঙ্গালী হিন্দু রঘুনন্দনের মতই মেনে চলছেন। দুর্গাপূজার দক্ষিণাদান অষ্টমীতে? না, নবমীতে? রঘুনন্দন নবমীতে দক্ষিণাদানের বিধানই ঘোষণা করেন। রঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতি তত্ত্বে এই রকম সব বিতর্ক ও সংশয়ের সমাধান আছে, যাতে নানা ধর্ম্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে আমরা সঠিক পথের সন্ধান পাই।

রঘুনন্দন মতে গয়াশ্রাদ্ধ পাঁচ দিনে উদ্‌যাপ্য। পাঁচ দিনে পঞ্চতীর্থে পিণ্ডদান। মিথিলার বাচস্পতি মিশ্র কিন্তু একই দিনে পঞ্চতীর্থে পিণ্ডদানের বিধান দেন। অধুনা বাঙ্গালীরা অধিকাংশই একই দিনে গয়াশ্রাদ্ধ সেরে নিচ্ছেন।

স্ত্রীবিয়োগে পুনরায় দারগ্রহণ কর্তব্য ব'লে মনে করেন স্মার্ত্ত পণ্ডিত রঘুনন্দন। কিন্তু ৪৮ বৎসরের পরে আর নয়। এর পরেও যদি কেউ বিবাহ করে তবে সে হয় রণ্ডাশ্রমী। মন্বাদি শাস্ত্রপ্রমাণে বিবাহে কন্যাশুল্কের নিন্দা করেছেন রঘুনন্দন। এ যুগে বেঁচে থাকলে বরপণের বিরুদ্ধেও নিশ্চয়ই তিনি সোচ্চার হতেন।

দায়ভাগ ও মিতাক্ষরা

পিতৃসম্পত্তিতে পুত্রের উত্তরাধিকার নির্ণয়ে রঘুনন্দন মনুর অভিমতেরই পরিপোষক। পিতার মৃত্যুর পরই পুত্রেরা পিতৃসম্পত্তির অধিকারী। মনুর ন্যায় নারদ ও দেবল প্রভৃতি সংহিতাকারগণেরও এই বিধান। জীমূতবাহন এই ব্যবস্থাকে বলেন—দায়ভাগ। রঘুনন্দনও

এই পরিভাষাই ব্যবহার করেছেন। বঙ্গদেশ, আসাম ও নেপালের কিছু অংশে দায়ভাগ প্রচলিত। কিন্তু দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর ভারতের সর্ব্বত্র এবং দক্ষিণ বিহার, কাশী ও উড়িষ্যায় মিতাক্ষরা বিধি প্রচলিত। মিতাক্ষরা অর্থে জন্মস্বত্ববাদ। অর্থাৎ, জন্মগ্রহণ মাত্রই পুত্র পিতৃসম্পত্তির অধিকারী। যাজ্ঞবল্ক্য, বিষ্ণু, বৃহস্পতি প্রভৃতি মিতাক্ষরা বিধির প্রবক্তা। স্মার্ত্ত শূলপাণিও এই মতের সমর্থক।

সন্দেহ নেই, স্মার্ত্ত রঘুনন্দন বাঙ্গালী হিন্দুকে অনেক ভাল জিনিসই উপহার দিয়েছেন। এক সংশয়াকীর্ণ যুগে রঘুনন্দনের বিধান সমাজকে রক্ষা করেছে। কিন্তু বল্লাল সেনের ন্যায় তিনিও যেন নূতন ক'রে ব্রাহ্মণ-কৌলীন্যের প্রতিষ্ঠায় অত্যাগ্রহী। মুসলমান শাসনে হিন্দুদের ধর্ম্ম-কর্ম্ম, জাতি-কূল নিরাপদ ছিল না। মহাপ্রভু হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনে বাধাপ্রাপ্ত হন। সুবুদ্ধি রায়ের জাতিটা মেরে দেয় স্বয়ং নবাব হুসেন শাহ। তখন প্রয়োজন ছিল ইসলামের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড প্রতিরোধ শক্তি গড়ে তোলার। ব্রাহ্মণদের পাশাপাশি ক্ষত্রিয় শক্তির জাগরণও ছিল অত্যাবশ্যক। কিন্তু রঘুনন্দন করলেন তার বিপরীত। তৎকালে ক্ষত্রিয়কে পরিণত করেন তিনি দাসে।

রঘুনন্দনের ব্রাহ্মণ-রক্ষণশীলতা

রঘুনন্দনের অভিমত এইরূপ—"যুগে জঘন্যে দ্বে জাতী ব্রাহ্মণ-শূদ্র এব হি।" জঘন্য যুগে মাত্র দুটি জাতিই আছে—ব্রাহ্মণ এবং শূদ্র। ক্ষাত্রশক্তির প্রতিভূ ক্ষত্রিয় এবং ধনোৎপাদক শক্তির উৎস বৈশ্য গেল মুছে। তিনি অবশ্য শূদ্রদিগকে দু'ভাগে বিভক্ত করেন—সৎ শূদ্র এবং অসৎ শূদ্র। কিন্তু সৎ বা অসৎ যা-ই হোক, কোন শূদ্রেরই গায়ত্রী মন্ত্রে এবং ওঁকার উচ্চারণে অধিকার নেই। শূদ্র ওঁকার স্থানে বলবে নমঃ। শূদ্র শ্রাদ্ধমন্ত্র পাঠের অধিকারীও নয়। শ্রাদ্ধের মন্ত্রাবলী পড়বেন ব্রাহ্মণ স্বয়ং, শূদ্র শুধু সায় দিবে—নমঃ এই মন্ত্র উচ্চারণে। এমন কি রঘুনন্দনের বিধানে শূদ্রের শ্রাদ্ধে পুরাণ পাঠও নিষিদ্ধ। পূজা, পার্ব্বণ, শ্রাদ্ধাদিতে শূদ্রকে পড়তে হবে—'অমুক দাসস্য' ইত্যাদি মন্ত্র। অর্থাৎ, ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর

সকলেই দাস। বৈদিক বর্ণাশ্রমের উপর ইহাপেক্ষা বড় আঘাত আর কি হতে পারে? রঘুনন্দনের কঠোর বিধান—ব্রাহ্মণ শূদ্রের বাড়ী যাবে না। শূদ্র অনাচরণীয়। এই ঘোর সামাজিক নির্ম্মম বৈষম্য অন্ত্যজদিগকে ইসলামে ঠেলে দেওয়ার সুযোগই বাড়িয়ে দেয়নি কি?

ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যেরা জঘন্য যুগে কেন শূদ্রত্বপ্রাপ্ত, তার সমর্থন তিনি খুঁজেছেন মনুসংহিতায়। "ইদানীন্তন ক্ষত্রিয়াণামপি শূদ্রত্বমাহ মনুঃ।" মনু বলেছেন—এই সকল ক্ষত্রিয় জাতি ক্রমশঃ ক্ষত্রিয়োচিত ক্রিয়ার লোপ ক'রে এবং ব্রাহ্মণদের দর্শন না পেয়ে শূদ্রধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়েছে।[১] তিনি বোধহয় মনে রাখেন নি যে, মনু ব্রাহ্মণকেও ছেড়ে কথা কন নি। যে ব্রাহ্মণ বেদাধ্যয়ন বর্জ্জনপূর্ব্বক অন্য বৃত্তি গ্রহণকারী সে সত্বর সপরিবারে শূদ্রত্বপ্রাপ্ত হবে।[২] অথবা বৈড়ালব্রতী ও বকব্রতী অবেদবিদ্ ব্রাহ্মণকে ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি এক ফোঁটা জলও দিবে না।[৩] তা হলে আজকের দিনে বেদবিৎ ব্রাহ্মণ ক'জন? জীবিকার ধাঁধায় অধুনা সকল কৃতী ব্রাহ্মণ সন্তানই বৃত্ত্যন্তরে রত। কতক অশিক্ষিত ও দরিদ্র উপবীতধারী পড়ে আছে পৌরোহিত্য কর্ম্মে। তারা মন্ত্রার্থ তো জানেই না, শুদ্ধ ভাবে মন্ত্রের উচ্চারণেও অক্ষম। আজকের দিনে কোন রঘুনন্দন যদি লিখেন—"যুগে জঘন্যে একা জাতি কেবলং শূদ্র এব হি"—তা হলে কিছু ভুল হবে কি? বস্তুতঃ, ব্রাহ্মণ এবং শূদ্রের ভিতর একটা বড় রকমের ঝগড়ার বীজ রোপণ ক'রে দিয়ে বিদায় নিলেন রঘুনন্দন।

কিন্তু না, কলহ নয়। চাই—মহাসমন্বয় ও মহামিলন। কে সেই বিধাতৃপুরুষ যিনি এই কার্য্যের জন্য নির্দ্দিষ্ট? তিনিই ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা যুগাচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দ। আলোচনার দীর্ঘ পথ অতিক্রম ক'রে তাঁর কাছে গিয়েই আমরা পৌঁছাবো।

---

(১) শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ।।

(২) যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ।। মনু ২।১৬৮

(৩) ন বার্য্যপি প্রযচ্ছেত্তু বৈড়ালব্রতিকে দ্বিজে।
ন বকব্রতিকে বিপ্রে নাবেদবিদি ধর্ম্মবিৎ।। মনু ৪।১৯২

পঞ্চম অধ্যায়

মহাপ্রভুর উদার ধর্ম্ম ও হিন্দু-সমাজ

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য ও হিন্দু-সমাজ

স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ব্রাহ্মণেতর সকল জাতিকে দাসে পরিণত ক'রে বৈদিক বর্ণবিন্যাসের যে বিকৃতি ঘটিয়েছিলেন, তাতে অব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রচণ্ড বিক্ষোভ ও বিদ্রোহ দেখা দিতে পারতো। কিন্তু তা যে ঘটেনি তার মুখ্য কারণ ঠিক এই সময়ে নবদ্বীপ ধামেই প্রেমাবতার শ্রীমন্ মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের আবির্ভাব এবং তদীয় উদার ধর্ম্মের ব্যাপক প্রচার। সেই ধর্ম্মীয় প্লাবনে জাত-পাতের দ্বন্দ্ব গেল ধুয়ে মুছে। বাংলার ইতিহাসে এ ঘটনা অবিস্মরণীয়।

কলিজীব স্বল্পায়ুঃ, স্বল্পশক্তিবিশিষ্ট। কলিজীবের এই আবল্য লক্ষ্যপূর্ব্বক তিনি প্রচার করেন সহজ শ্রীহরিনাম। "হরের্নামৈব কেবলম্।" কলিযুগে চিত্তশুদ্ধি, চারিত্রিক উন্নতি, ভগবদনুগ্রহ ও মুক্তির ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা সহজ পথ। এই সহজিয়া ধর্ম্মে উচ্চ-নীচ ভেদ নেই, ব্রাহ্মণ-চণ্ডালের দ্বন্দ্ব নেই, ধনী-দরিদ্রের প্রশ্ন নেই। এই ধর্ম্মে সব একাকার। সমাজের যারা অবহেলিত ও উপেক্ষিত সকলকে কোল দিলেন প্রেমময় প্রভু। সকলকে দিলেন আলিঙ্গন। বললেন—"আচণ্ডালে দেহ প্রেম।" ইসলামের প্রভাবমুক্ত হয়ে যে সকল বৌদ্ধ বঙ্গে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রেখে চলেছিল তারাও এই উদার ধর্ম্মে নিরাপদ আশ্রয় লাভ পূর্ব্বক হিন্দু-সমাজের মূল স্রোতে মিশে গেল। হিন্দুসমাজের বিভেদের ছিদ্রের সুযোগ নিয়ে ইসলামে ধর্ম্মান্তরিত করণের পথও হলো নিরুদ্ধ। প্রেমধর্ম্মের উদার মঞ্চে আচণ্ডাল হিন্দুকে একত্রিত ক'রে তিনি যে সংগঠন আনয়ন করেন তা তুলনাবিহীন।

শুধু হিন্দু নয়, মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্মে মুসলমানও পেয়েছে ঠাঁই। প্রতিদিন তিন লক্ষ হরিনাম জপকারী হরিদাস। তাঁকে আলিঙ্গন

দিয়ে ভক্তের প্রশংসায় প্রভু উচ্ছ্বসিত।

প্রভু কহে তোমা স্পর্শি পবিত্র হইতে।
তোমার পবিত্র ধর্ম্ম নাহিক আমাতে।।
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি সর্ব্বতীর্থে স্নান।
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি যজ্ঞ, তপোদান।।
নিরন্তর কর চারি বেদ অধ্যয়ন।
দ্বিজন্যাসী হতে তুমি পরম পাবন।।

অর্থাৎ, এক হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনেই তীর্থস্নান, যজ্ঞ, তপস্যা, দান, বেদাধ্যয়ন আদি পুণ্য কর্ম্মের ফল পাওয়া যায়। হরিনামে হয় সর্ব্বপাপক্ষয়। যবনও হয় পরম পাবন। বাংলার নবাব হুসেন শাহ সুবুদ্ধি রায়ের জাত মেরে দিলে তিনি প্রায়শ্চিত্তের বিধান চাইতে গেলেন নবদ্বীপ থেকে কাশীর পণ্ডিতদের কাছে। বিধান যা পাওয়া গেল তা অতি নিষ্ঠুর ও অমানবিক।

প্রায়শ্চিত্ত পুছিলেন পণ্ডিতের স্থানে
তাঁরা কহে তপ্তঘৃত খাঞা মর প্রাণে।।

নিরুপায় সুবুদ্ধি রায় শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শরাণগত। তিনি তাঁকে কোল দিয়ে বলেন—কি হয়েছে তোমার? কিছুই হয় নি। হরিনাম কর।

এক হরিনামে তব পাপদোষ যাবে।
অন্য হরিনামে কৃষ্ণ-চরণ পাইবে।।

স্মার্ত্ত জীমূতবাহন, শূলপাণি, রঘুনন্দনের সকল বিধান গেল তলিয়ে। প্রায়শ্চিত্ত-টায়শ্চিতের জটিল আড়ম্বর নয়—যবন-সংশ্রব থেকে মুক্তির সহজ পথ শ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ত্তন।

মহাপ্রভুর এই সহজ ধর্ম্ম রঘুনন্দনপন্থী রক্ষণশীল ব্রাহ্মণদের মনঃপূত নাও হতে পারে।

রঘুনন্দন ও দেবীবর ঘটকের পরবর্তী নূলা পঞ্চানন মহাপ্রভু চৈতন্যদেবকে বলেন—"চৈয়ে ছোঁড়া।" তিনি "বড় দুষ্টমতি।"* এই ভদ্রলোক স্মৃতিকার রঘুনন্দন এবং ন্যায়পণ্ডিত রঘুনাথ শিরোমণিকেও

* চৈয়ে ছোঁড়া দুষ্টমতি নিমে তার নাম।

এক হাত নিয়েছেন। তাঁর মতে তিন জনে তিন পথে কাঁটা ছড়িয়েছেন।

তিন জনে তিন পথে কাঁটা দিল শেষ।
ন্যায় স্মৃতি ব্রহ্মাচর্য্য হইল নিঃশেষ।।
কাণার সিদ্ধান্তে ন্যায় গৌতমাদি হত।
প্রাচীন স্মৃতির মত নন্দা হাতে গত।।
শচী ছেলে নিমে বেটা নষ্টমতি বড়।
মাতাপত্নী দুই ত্যাগী সন্ন্যাসেতে দড়।।

নূলা পঞ্চাননের এই কারিকায় সমাজ-বিবর্ত্তনের প্রসঙ্গই দেখি। তিনি দেবীবর ঘটকের মেলবন্ধনের স্তুতিবাদক। সে প্রসঙ্গে আমরা শীঘ্রই আসছি।

মহাপ্রভুর কাজি দলন

মহাপ্রভুর প্রসঙ্গে ফিরে আসি। যে যুগে রঘুনন্দন ক্ষত্রিয়কে দাসে পরিণত করে হিন্দু-সমাজকে ক্লীব ও প্রতিরোধশক্তিহীন ক'রে ছাড়েন, ঠিক সেই যুগেই মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যে ভক্তির সহিত শক্তির সমন্বয় দর্শনে আমরা চমৎকৃত হই। ইসলামের শাসনে হিন্দুরা কোন কালেই স্বস্তিতে থাকতে পারেনি। এমন কি মোগল সম্রাট আকবরের সময়েও নয়। ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গে মোগল শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। আকবর হিন্দুদের সম্বন্ধে সাম্য নীতি অবলম্বন ক'রে চলেছেন রাজনৈতিক কৌশল হিসাবে। কিন্তু মৌলবাদী সুন্নীরা তা ভাল চোখে দেখে নি। তাদের দৃষ্টিতে হিন্দুরা কাফের এবং পৌত্তলিক। সুতরাং তদ্রূপ ব্যবহারই তাদের প্রাপ্য। মোগল শাসনেও বাংলার হিন্দু পরম শান্তিতে ঘর-সংসার করেছে, এমন বলা যায় না। সুতরাং, হুসেন শাহের আর কা কথা? নবদ্বীপের কাজি ফতোয়া জারী করে—হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন চলবে না, নদীয়ায় হিন্দুয়ানী চলবে না। কাজি হরিভক্তদের মারধোর করে, মৃদঙ্গ ভেঙ্গে দেয়, শাসানি দেয়—আজ ছেড়ে দিলাম, কিন্তু "আর দিন নাগলি পাইলে লৈব জাতি।"

কি এতবড় স্পর্দ্ধা! কাজি নষ্ট করবে হিন্দুয়ানি। জাত নষ্ট

করবে? খোল-করতাল ভাঙ্গবে? বন্ধ করবে হরিনাম? "ক্রোধে হইলেন প্রভু রুদ্র মূর্ত্তিধর।" প্রতিজ্ঞা—"সর্ব্ব নবদ্বীপে আজি করিমু কীর্ত্তন। দেখি মোরে কোন্ কর্ম্ম করে কোন্ জন।" তারপরের ঘটনা সংক্ষেপেই বলি। প্রভুর নেতৃত্বে এক বিরাট সঙ্কীর্ত্তনবাহিনী সদর্পে কাজির দ্বারে হানা দেয়। সহিংস শ্লোগান—"আজি কাজি মার।" সেই মারমুখী জনতাকে ঠেকায় কার সাধ্য? কাজির বাড়ীতে চলে ব্যাপক ভাঙচুর। ঘর-বাড়ী, গাছপালা, ফুলের বাগান তছ্নছ্। প্রভুর নির্দ্দেশ—

আসিয়া কাজির দ্বারে প্রভু বিশ্বম্ভর।
ক্রোধাবেশে হুঙ্কার করয়ে বহুতর।।
ক্রোধে বলে প্রভু আরো কাজি বেটা কোথা।
ঝাট আনি ধরিয়া কাটিয়া ফেল মাথা।।
নির্যবন করোঁ আজি সকল ভুবন।
পূর্ব্বে যেন বধিয়াছি যে কাল যবন।।
অগ্নি দেহ ঘরে তোরা না করিহ ভয়।
আজি সব যবনের করিমু প্রলয়।।

সত্যই প্রভু আজ কালযবনহন্তা। ভীত, সন্ত্রস্ত কাজি ক্ষমা প্রার্থনাপূর্ব্বক প্রাণরক্ষা করে। প্রতিশ্রুতি দেয়—হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে আর বাধা থাকবে না। বিজয়ী ভক্তদের কণ্ঠে গগনভেদী হরিধ্বনি। আর পরবর্ত্তী হরিভক্তদের দশা?

ক্ষাত্রশক্তির পুনর্জাগরণে স্বামী প্রণবানন্দ

ইং ১৯৩৯ সাল। রাত্রি এগারটা। কলিকাতার বস্তিবাসী একদল উৎকলী হরিভক্তের কান্না—তারা দু'শ ভক্ত মিলে যখন হরিসঙ্কীর্ত্তন করছিল তখন দুজন বিধর্ম্মী গুণ্ডা এসে শুধু তাদের কীর্ত্তন বন্ধ করেই দেয় নি—খোল ভেঙ্গে ফেলে, শ্রীকৃষ্ণ ও জগন্নাথদেবের ফটো টেনে ফেলে দেয়। সব শুনে সঙ্ঘনেতা প্রণবানন্দ বলেন—"তোমাদের পূজার বেদীতে নিশ্চয়ই দেবতা ছিলেন না। তোমরা নিজেদের ক্লৈব্যদৌর্ব্বল্য ও অকর্ম্মণ্যতাকেই

দেবতার আসনে বসিয়ে পূজা করছিলে। তোমরা অন্ততঃ দু'শ জন, দুর্ব্বৃত্তেরা মাত্র দু'জন। যদি অন্ততঃ একটা দুর্ব্বৃত্তেরও মুণ্ডুপাত ক'রে আসতে, তবে বুঝতাম তোমরা ঠিক ঠিক শ্রীকৃষ্ণের পূজারী।"

তৎকালে সমস্ত ভারত—বিশেষতঃ বঙ্গদেশে মুসলিম লীগের কদর্য্য তাণ্ডব। বিপন্ন হিন্দুর রক্ষার জন্য স্বামী প্রণবানন্দ তখন পাঁচ লক্ষ রক্ষী নিয়ে বিরাট বাহিনী গঠনে সঙ্কল্পবদ্ধ। বাংলায় লুপ্ত ক্ষাত্রশক্তির পুনরুজ্জীবনে তিনি অতিমাত্র তৎপর। স্থানে স্থানে শিবির খুলে তাদিগকে দিচ্ছেন হাতিয়ার চালানোর শিক্ষা। মেয়েদের হাতেও তুলে দিচ্ছেন আত্মরক্ষার উপযোগী ভাবে প্রস্তুত ত্রিশূল। পাঞ্জাবের শিখগুরু গোবিন্দ সিংহ ব্যতীত এ কাজটি ইতঃপূর্ব্বে কোন ধর্ম্মগুরুই করেন নি। হিন্দুর ভিতরে শৌর্য্যবীর্য্যের অনুপ্রেরণা দিতেই ত্রিশূলধারী, ত্রিপুরারি শিব এবং অঘ-বক-কংস-কেশী আদি দৈত্যহারী, কুরুক্ষেত্রের অধিনায়ক চক্রধারী শ্রীকৃষ্ণের আদর্শের প্রচার করছিলেন স্বামীজী মহারাজ। শ্রীকৃষ্ণের উপাসক মার খাবে যবনের হাতে? এ আবার কি কথা?

গৌড়ীয় মতে রক্ষণশীলতা

আবার শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে এমন অনমনীয় সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামি কেন? শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্ম, তিনি স্বয়ং ভগবান্, তিনি অবতার নহেন, অবতারী। অর্থাৎ, অন্যান্য অবতার তাঁর অংশ মাত্র। দার্শনিক বিচারে জগৎ, জীব ও ব্রহ্মের তত্ত্ব ভিন্নাভিন্ন—এই ভেদাভেদ সম্বন্ধ অচিন্ত্য। এতে আপত্তির কিছু নেই। বেদান্তের ভাষ্য নিয়ে আচার্য্যগণের ভিতরে ঐকমত্য কখনো হয় নি। আচার্য্য শঙ্করের অদ্বৈতবাদও গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের অভিপ্রেত না হতে পারে। এ নিয়ে সাধারণ জনতা কিন্তু মাথা ঘামায় না। কিন্তু গৌড়ীয়রা যখন বলেন—শ্রীকৃষ্ণই পরম—অন্য দেবতারা কৃষ্ণের দাস। সুতরাং, অন্য দেবতার পূজা করবে না, অন্য দেবতাকে প্রণাম

করবে না, অন্য দেবতার প্রসাদ খাবে না,* তখনই শৈব, শাক্তাদি সম্প্রদায়ের সহিত সৃষ্টি হয় বিরোধের, ভেঙ্গে যায় হিন্দুর অখণ্ড সংহতি। সমাজক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য সকল বর্ণকে দাসে পরিণত ক'রে স্মার্ত্ত রঘুনন্দন এ রকম ভাঙ্গার কাজটিই ক'রে গিয়েছেন। ধর্ম্মীয় মতবাদ নিয়েও কি সমাজ ভাঙ্গবে? এই ভাঙ্গার শেষ তবে কোথায়?

গৌড়ীয়দের যুক্তি—কৃষ্ণের মায়াশক্তি প্রভাবে মানুষ নানা দেবদেবীর উপাসনা করে বিশেষ বিশেষ কামনা সিদ্ধির জন্য। দেবদেবীর উপাসনায় কামনা সিদ্ধি হ'তে পারে, কিন্তু মুক্তিবিধাতা একমাত্র কৃষ্ণ। সুতরাং, কৃষ্ণভক্তদের অন্য দেবতার পূজা নিষ্প্রয়োজন। গৌড়ীয়দের কাছে শিবের সমাদর অবশ্য আছে, তবে পরম বৈষ্ণবরূপে। তিনি বৈকুণ্ঠের দ্বারবান্। অর্থাৎ, তিনিও কার্য্যতঃ কৃষ্ণের দাস। গৌড়ীয় মতে দীক্ষিত গৃহীদের মৃতের শ্রাদ্ধ স্মার্ত্ত মতে হবে না, হবে গৌড়ীয়দের নিজস্ব মতে।

শাক্ত-বৈষ্ণবের কলহ

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের সঙ্গে শাক্তদের কলহ সর্ব্বাপেক্ষা প্রকট। রাসপূর্ণিমায় বৈষ্ণব-শাক্তের এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার দৃশ্য আজো দেখা যাবে নবদ্বীপে। শাক্ত মতের নামে উচ্ছৃঙ্খল যুবাদের মদ্যপানের উন্মত্ততা কোন মতেই সমর্থনযোগ্য নয়। ওরা শুধুই মাতাল, শুদ্ধ শাক্ত বলা যাবে না। হয়তো এই কারণেই গৌড়ীয়েরা এক সময় কালী ও দুর্গাকে মদ্যপায়িনীরূপে ব্যঙ্গ করতেন। কিন্তু এটাও ঠিক নয়। এই ঝগড়া সমর্থন করেন নি স্বামী প্রণবানন্দ। এইরূপ নিন্দাকারীদের লক্ষ্যপূর্ব্বক বলেছেন—"শিক্ষিত সন্ন্যাসী হয়েও যদি

---

* বৈষ্ণবদের এই মতের সমর্থন বহু পুরাতন। যথা—

পাবনং বিষ্ণুনৈবেদ্যং সুরসিদ্ধর্ষিভিঃ স্মৃতং।
অন্যদেবস্য নৈবেদ্যং ভুক্ত্বাচান্দ্রায়ণং চরেৎ।। স্কন্দ পুরাণ
নৈবদ্য-গ্রহণ-স্পর্শ-দর্শনং ভক্ষণং তথা।
দেবতানাঞ্চ যৎ পেয়ং ন কুর্য্যাদ্ বৈষ্ণবঃ সুধীঃ।। পদ্মপুরাণ

তারা এরূপ করে, তবে বিধর্ম্মীরা কালীর মুণ্ডু ভাঙ্গবে এটা আর বিচিত্র কি? যে কৃষ্ণ, সেই কালী, সেই শিব। একই পরমেশ্বরের বিভিন্ন প্রকাশ। ভেদদৃষ্টি অনুচিত।"

মহাপ্রভু ভেদ চান নি

মহাপ্রভু কিন্তু এরূপ কলহ চান নি। তিনি একান্ত কৃষ্ণভক্তই ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলতে তিনি লক্ষ্য করেছেন অনন্ত অদ্বিতীয় পরমব্রহ্মকে। তিনিও ছিলেন নাস্তিক্যবাদ ও অদ্বৈতবাদের একান্ত বিরোধী। তৎসত্ত্বেও তাঁর ছিল এক উদার ও সহনশীল মন। তৎপ্রচারিত ধর্ম্মে মতবাদ অপেক্ষা ভাবের প্রাধান্যই অধিক। তিনি নিজে কোন সম্প্রদায় গঠনে ব্যগ্র ছিলেন এমন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। যে যে-নিষ্ঠায় ঈশ্বরের আরাধনা করুন তিনি তাঁর নিন্দা করেন নি। বরং দেখা গেছে, তিনি বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত সকল মন্দিরে গিয়ে ভক্তিভাবে সেই সকল স্থানীয় পূজায় যোগ দিয়েছেন। কিন্তু চৈতন্যোত্তর গৌড়ীয়গণ প্রভুর ধর্ম্মের এই উদার চরিত্র রক্ষা করতে পারলেন কি? গড়ে উঠলো আর একটি অতি গোঁড়া ধর্ম্মীয় সম্প্রদায়।

স্বামী প্রণবানন্দের সমন্বয়

যুগাচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দ কিন্তু দীক্ষায় শৈব যোগী এবং সন্ন্যাসে শঙ্করপন্থী হয়েও আজীবন হরিনামে প্রীতিপর। সেই বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে তদীয় সাধনকুটীরে নিত্য অনুষ্ঠিত হতো শ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ত্তন। এই সময়ে তিনি ভক্তগণপরিবৃত হয়ে হরিসঙ্কীর্ত্তন সহ গ্রাম-গ্রামান্তর পরিক্রমণ করেছেন। তদীয় সাধনসিদ্ধপীঠ বাজিতপুর প্রণবমঠের বার্ষিকোৎসব-আঙ্গিনায় আজো অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে প্রাণঢালা অষ্টপ্রহর হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন। সর্ব্বশ্রেণীর হিন্দুর ভিতরে মিলন, ঐক্য ও সমন্বয় বিঘ্নিত হোক, এমন কোন মতবাদের সমর্থন দেন নি স্বামী প্রণবানন্দ। অধিকন্তু অখণ্ড ঐক্যের ভূমি সুদৃঢ় করতেই হিন্দুর লোকায়ত ব্রত-পার্ব্বণগুলিকেও মার্জ্জিত আকারে দিয়েছেন

প্রাপ্য স্বীকৃতি। শ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ত্তনকে তিনি সর্ব্বশ্রেণীর হিন্দুর মিলনের অন্যতম অবিরোধী উপায় মনে ক'রে বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। সমাজ ও ধর্ম্মক্ষেত্রে খণ্ড খণ্ড সম্প্রদায় গড়তে এবং পরস্পর বিবাদ সৃষ্টি করতে প্রচুর কৃতিত্ব দেখা গেছে যুগে যুগে। কিন্তু মহামিলন ও মহাসমন্বয়ের কথা ভেবেছেন কয়জন?

ষষ্ঠ অধ্যায়

দেবীবর ঘটক ও মেলবন্ধন

বাংলার হিন্দু-সমাজের বিবর্ত্তন ইতিহাসের এক বিচিত্র অধ্যায়ে আমরা প্রবেশ করছি। এই অধ্যায়ের মুখ্য নায়ক দেবীবর বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁর প্রসঙ্গ পূর্ব্বে উঠেছিল। ইনি পঞ্চদশ শতাব্দীর লোক। পিতা সর্ব্বানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। দক্ষিণ রাঢ়ী ব্রাহ্মণ সমাজের বিবাহ ব্যাপারে ইনি 'মেল' রীতির প্রবর্ত্তক। তাই ইনি দেবীবর ঘটক নামেই অধিক পরিচিত। এক কুলজী গ্রন্থের মতে মেল বন্ধনের তারিখ ১৪০২ শকাব্দ বা ১৪৮০-৮১ খৃষ্টাব্দ।

দেবীবর যে সময়ের লোক, সেও সমাজের এক বিপর্য্যয়ের যুগ। বল্লাল প্রবর্ত্তিত নবধা লক্ষণবিশিষ্ট কৌলীন্যে চিড় ধরতে বেশী সময় লাগে নি। উন্নত চরিত্রগুণ সংরক্ষণে অসমর্থ কুলীনেরা নানা দোষে দুষ্ট। অসম যৌন সম্পর্ক, যবনসংশ্রব প্রভৃতি নানা কারণে কুলীন সমাজের গৌরব তিরোহিত। এ সকল কারণে একের সহিত অন্যের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে সমস্যা দেখা দেয়। এমন পরিস্থিতি ঘটে যে, যবন-সংশ্রব জনিত দোষে এক-ঘরেদের ইসলাম গ্রহণ অনিবার্য্য হয়ে পড়ে। এর একটা সময়োচিত মীমাংসা প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। নূলা পঞ্চানন লিখেছেন—

এই কালে রাঢ়ে বঙ্গে পড়ে গেল ধূম।
বড় বড় ঘর যত হইল নির্ধূম।।

এই কালে সঙ্কেতের বংশে এক ছেলে।
নামে খ্যাত দেবীবর লোকে যারে বলে।।
সেই ছোঁড়া মনে করে কুলে করে ভাগ।
তদবধি কুলে আছে ছত্রিশের দাগ।।
দোষে দোষে কুল করে একি চমৎকার।
অজ্ঞান কুলীন-পুত্র কুলে হয় সার।।

অর্থাৎ, তখন বড় বড় ঘরও নির্ধূম (কৌলীন্যভ্রষ্ট) হয়েছিল। দেবীবর ঘটক দোষে দোষে মিলিয়ে কুলবন্ধন করেন এবং তাতে ভ্রষ্ট কুলীনেরা স্বীয় স্বীয় উচিত কুল পায়। এরূপ ছত্রিশটি মেলের সৃষ্টি করেন দেবীবর। বস্তুতঃ দেবীবর নিষ্কলুষ কুলীন একজনও খুঁজে পান নি। সকলেই কোন না কোন দোষে দুষ্ট। কারো দোষ অধিক, কারো দোষ কম। 'দোষ নাই যার, কুল নাই তার।' ঘটকের প্রযত্নে যবনদোষে দুষ্ট কুলীনও সমাজে স্থান পায়।

দেবীবরের ছত্রিশ মেল

পণ্ডিত দীনবন্ধু বেদশাস্ত্রীর 'সমাজ বিপ্লব' গ্রন্থে দেবীবর সম্বন্ধে তথ্য পাওয়া যায় যে, তিনি কুলীনদের ভিতরে নানারূপ অপবাদ ও দোষ সংগ্রহপূর্ব্বক 'মেল' গঠন করেন। কথিত হয় এ বিষয়ে দেবীবর সমকালীন বাছা বাছা কুলীন পণ্ডিতদের পরামর্শ নিয়েছিলেন। কুলীনদের ভিতরে কি কি দোষ ঘটেছিল, কি কি দোষে কে কে মেলের কুলীন হন, দেবীবরের 'মেলবিধি' নামক সংস্কৃত গ্রন্থে তার বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ। দোষগুলিকে তিনি প্রধান তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন—জাতিগত দোষ, কুলগত দোষ এবং শ্রোত্রিয়গত দোষ। দোষানুসারেই মেলের নামকরণ। দেবীবরের 'দোষ নির্ণয়' গ্রন্থে জানা যায়, তিনি মোট ৩৬টি মেলের প্রবর্ত্তক। তন্মধ্যে ২২টি চরিত্রের নামে, ৬টি গ্রামের নামে ও ৫টি দোষের নামে ঘোষিত। প্রকৃতি অনুসারে মেল ২২টি। যথা—বল্লভী, সর্ব্বানন্দী, সুরাই, চট্টরাঘবী, ভৈরব ঘটকী, মাধাই, চান্দাই, বিজয় পণ্ডিতী, শতানন্দখানী, মালাধরখানি, দশরথ ঘটকী, কাকুস্থী, চন্দ্রাপতি,

গোপাল ঘটকী, বিদ্যাধরী, পরমানন্দমিশ্রী ও ছয়ী প্রভৃতি। গ্রাম অনুসারে মেল ৬টি। যথা—ফুলিয়া, খরদহ, দেহাটা, বাঙ্গাল, বালী ও নড়িয়া। উপাধি অনুসারে মেল ৩টি। যথা—পণ্ডিতরত্নী, প্রমোদিনী ও হরি মজুমদারী।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হয়েছে মেল গঠিত হয়েছে মুখ্যতঃ অসম যৌন সম্পর্ক ও যবন-সংস্রব বশতঃ। কলু ও কোচ জাতির সংস্রবে বিজয়পণ্ডিত মেল, হেড়ো ও হালান্ত জাতির সংস্রবে বিদ্যাধরী মেল, রজক জাতির সংস্রবে শ্রীরঙ্গভট্টি ও গোপাল ঘটকী মেল এবং বেড়ুয়া, হাড়ী ও যবনজাতির সংস্রবে পণ্ডিতরত্নী মেলের বন্ধন। এর পর অবশিষ্ট ১১টি মেলের উৎপত্তি যবন-সংস্রবে। দেবীবর ঘটকের মতে এইগুলিই জাতিগত দোষ।

কুলগত দোষ

কুলগত দোষের সংখ্যা ৪৬টি। তম্মধ্যে রণ্ডদোষে ৯টি, বলাৎকার দোষে ১২টি, বিপর্য্যয় দোষে ৬টি, খঞ্জদোষে ৭টি, স্বজনাক্ষেপ দোষে ২টি, অন্যপূর্ব্বা দোষে ২টি, বিসর্জ্জন দোষে ১টি, ব্রহ্মহত্যার দোষে ২টি এবং কন্যাবহির্গমন দোষে ৫টি মেলের রচনা। কন্যা ও কুলের অভাব হলে এবং রণ্ডিকা বা বেশ্যাগমন করলে রণ্ডদোষ, পিতৃপক্ষের সাত এবং মাতৃপক্ষে পাঁচ পুরুষের বিবাহ হলে স্বজনাক্ষেপ দোষ, পর্য্যায় ভেঙ্গে কাজ করলে বিপর্য্যয় দোষ, কুমারী কন্যার সঙ্গে পরপুরুষের যৌনসঙ্গ হলে অন্যপূর্ব্বা দোষ হয়। এই রকম সমস্ত ব্যাপার কুলগত দোষের জনক। অর্থাৎ, দেবীবরের সময়ে দোষে দোষে সমাজ বিপর্য্যস্ত, শৃঙ্খলাহীন, নীতিবর্জ্জিত। বিচিত্র দোষগ্রস্ত কুলীনদের ভিতরে শুধু বৈবাহিক সম্বন্ধই নয়, অন্নগ্রহণও বন্ধ হয়। কথিত আছে, মুখ্য কুলীন যোগেশ্বর পণ্ডিত বংশজ কুলীন দেবীবরের গৃহে অন্নগ্রহণ করেন নি। এই ঘটনাই তাঁকে আঘাত দিয়েছিল। মেলবন্ধন-রীতি প্রবর্ত্তনের সঙ্কল্প এই সময়েই তাঁর মনকে নাড়া দেয়।

কুলীনদের ভিতরে যারা অধিক দোষাশ্রিত দেবীবরের বিধানে

তারা নিষ্কুল হয়। তারা গণ্য হয় 'ছাঁটা বংশজ' রূপে। এই নিষ্কুলেরা অধিকাংশই ইসলামে চলে যায়। অবশিষ্ট কিছু সংখ্যক মাত্র জাতিভ্রষ্ট হয়েও হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করে নি। তাদের ভিতরে পিরালী ও শেরখানী ব্রাহ্মণদের নাম উল্লেখযোগ্য।

প্রকৃতি ও পালটী

মেলবন্ধন প্রথায় 'প্রকৃতি' ও 'পালটী'—এই দুই পরিভাষার গুরুত্ব উল্লেখযোগ্য। যাঁর থেকে কুলের উৎপত্তি তিনি 'প্রকৃতি', আর যাঁর সঙ্গে কুল ক'রে তিনি সমমর্য্যাদাসম্পন্ন তিনি 'পালটী'। মেল, যূথ ও থাক নিয়ে কুলীনের প্রকৃতি ও পালটী। এই প্রকৃতি ও পালটীর ভিতরেই বৈবাহিক আদানপ্রদান ঘটবে। এর বাইরে যাওয়া চলবে না—গেলে কুল নষ্ট হবে। আমরা দেখি—এই কুলরক্ষার দায়েই কুলীন সমাজে এক বরের বহু বিবাহ প্রচলিত হয় এবং সমাজে তা এক নূতন সমস্যার সৃষ্টি করে। তবে দেবীবরের মেল বন্ধন প্রথা থেকে একটা বিষয় অতি সুস্পষ্ট যে, তখন যবন-সংশ্রবে হিন্দুদের জাত-খোয়ানির মাত্রা বেশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। জাতিগত দোষের এগারটিই যবন-সংশ্রবজনিত। এই সকল জাতিচ্যুতদের হিন্দু-সমাজের মূল স্রোতে ধ'রে রাখতে মেলবন্ধন কিছুটা সাফল্যের দাবী রাখতে পারে, তবে ষোল আনা নয়। তথাপি নূলা পঞ্চাননের উক্তি পুনঃ স্মরণ করতে পারি।

দোষে দোষে কুল করে একি চমৎকার।
অজ্ঞান কুলীন পুত্র কুলে হয় সার।।

লক্ষ্যণীয় যে, দেবীবরের কাজ শুধু নানা দোষে দুষ্ট কুলীন ব্রাহ্মণদের ভিতরেই সীমাবদ্ধ। তার বাইরে যবন-সংশ্রব দোষে দুষ্ট ও বিপর্য্যস্ত বিরাট হিন্দুসমাজের জন্য তিনি কি করলেন? তাই এক অব্যক্ত বেদনার কান্না থেকেই গেল। কবে আসবে সেই শুভ দিন যেদিন গুণে গুণে মেলবন্ধন ক'রে সংগঠিত হবে এক অখণ্ড হিন্দু মহাজাতি? সেই অভিনব মেলবন্ধনের ভবিষ্য ঘটক কে? সময়ে মানুষ আবিষ্কার করবে তাঁকেই।

সপ্তম অধ্যায়

নবাবী আমলে বাংলার হিন্দু

আমরা দেখেছি ১১৯৯ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্মণ সেনের আমলেই সাহাবুদ্দীন ঘোরীর প্রতিনিধি তুর্কী বখ্‌তিয়ার খিলজী কর্ত্তৃক বাংলায় ইসলামের বিজয়। ক্রমে ইসলামের শাসন বাংলায় জাঁকিয়ে বসে। ১৩৩৬ খৃষ্টাব্দে দিল্লীশ্বর মহম্মদ তোগলকের রাজত্ব কালে বাংলার মুসলমান শাসকেরা স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে হুসেন শাহ যখন বাংলার নবাব সেই সময়ে স্পষ্টতঃ লক্ষ্য করি হিন্দুদের ধর্ম্মকর্ম্মে কতখানি নিরাপত্তার অভাব। নদীয়ায় হিন্দুয়ানী চলবে না ব'লে ফতোয়া জারি করে নবদ্বীপের কাজি। ভেঙ্গে ফেলে মহাপ্রভুর সঙ্কীর্ত্তন দলের খোল-করতাল। হুসেন শাহ্ নিজে সুবুদ্ধি রায়ের জাতটা দেয় মেরে। ভারতে ইসলামের প্রথম পদক্ষেপ থেকেই চলে হিন্দুদের ধর্ম্মান্তর—হিন্দুনারীর ধর্ষণ ও হিন্দুর ধর্ম্মস্থানের উপর আঘাত। বাবরের আমলেই অযোধ্যার রামমন্দির ভেঙ্গে দিয়ে গড়া হয় মসজিদ—যা নিয়ে আজো চলছে রক্তাক্ত বিতর্ক। দেবীবর ঘটকের বর্ণিত জাতিগত দোষের মধ্যে এগারোটিই যবন-সংশ্রব ঘটিত। এই বিবরণ শুধু রাঢ়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণদের। বরেন্দ্রভূমির ব্রাহ্মণরাও কি অক্ষত ছিলেন? আর সারা বঙ্গের অব্রাহ্মণ হিন্দুদের যবন-সংশ্রবের হিসাবটা দেবীবর ঘটক দিয়ে যান নি। পাঠকেরা অনুমান করুন—ওটি কত ভয়াবহ!

১৫৩৯ খৃষ্টাব্দে পাঠান বংশীয় শেরসাহ কর্ত্তৃক বঙ্গবিজয়। অতঃপর মোগল সম্রাট আকবরের আমলে ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশ চলে যায় মোগলের শাসনে। আমরা আরো দেখেছি আকবরের আমলেও গোঁড়া সুন্নীদের দৃষ্টিতে হিন্দুরা কাফের। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে বাংলার মস্‌নদে বসে আলিবর্দ্দি খাঁর দৌহিত্র সতেরো বৎসরের নাবালক সিরাজদ্দৌলা। দিল্লীশ্বর মোগল বাদশাহের ক্ষমতা তখন অস্তমিত। এই সুযোগে মোগলের সুবাদারী গ্রহণের তোয়াক্কা না

ক'রে সিরাজ স্বাধীন নবাবরূপে অধিষ্ঠিত। নবাবী শাসনের শেষও কিন্তু সিরাজের সময়েই। এই সময়ে হিন্দুদের দুর্দ্দশা চরম শিখরে। এই বালক নবাব ছিল স্বভাবে চরিত্রহীন, লম্পট, মদ্যপ, বিলাসী, কুসংসর্গী এবং সর্ব্বোপরি পরনারীলোলুপ। স্বভাবতঃ নিপীড়তদের ভিতরে চাপা বিদ্রোহ। কিন্তু হিন্দুরা অসংগঠিত ও প্রতিরোধ শক্তিহীন। তাদের ধন, মান, প্রাণ, ইজ্জৎ বিপন্ন। অন্যদিকের চিত্রটি এইরূপ : সিরাজের প্রধান সেনাপতি মীরজাফর নবাবী দখলের জন্য ইংরাজদের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। ফলে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে ইংরাজ সেনাপতি লর্ড ক্লাইভের হাতে সিরাজের শোচনীয় পরাজয় এবং পরে নির্ম্মম ভাবে মৃত্যুবরণ।

কোম্পানীর শাসনের সূত্রপাত

ইংরাজের করুণায় বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর বসে বাংলার মসনদে। কিন্তু কার্য্যতঃ সে ইংরাজের হাতের ক্রীড়নক মাত্র। নবাবী শাসনও চলে যায় ইংরাজ বণিকের হাতে। বাংলার গভর্ণর ও প্রধান সেনাপতির দায়িত্ব নিয়ে লর্ড ক্লাইভ দ্বিতীয়বার আসেন বঙ্গদেশে। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর সম্রাট সাহ্ আলমের নিকট থেকে বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা রাজস্ব প্রদানের শর্ত্তে ইনি বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী ভার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অনুকূলে পাইয়ে দেন। ফলে বাংলার সমস্ত রাজস্ব আদায় করতে থাকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী। তারা দেশরক্ষার জন্য সেনা রাখার অধিকারও লাভ করে। ৫০ লক্ষ টাকা বার্ষিক বৃত্তির বিনিময়ে মীরজাফর পায় শুধু নাজিমত্ব। অর্থাৎ, ফৌজদারী বিভাগের কর্তৃত্ব। বাংলার এই সময়কার চিত্র যেমন গোলমেলে ও মারাত্মক, তেমনি অতি দারুণ ও করুণ। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র তদীয় অমর উপন্যাস 'আনন্দ মঠে' এই চিত্রের এক বাস্তব ও প্রামানিক রূপ বর্ণনপূর্ব্বক লিখেছেন—"মীরজাফর আত্মরক্ষায় অক্ষম। বাংলা রক্ষা করিবে কি প্রকারে? মীরজাফর গুলী খায় ও ঘুমায়। ইংরাজ টাকা আদায় করে ও ডেস্‌প্যাচ লেখে। বাংলা কাঁদে আর উচ্ছন্ন যায়।" দু'বছর পর

পর অজন্মায় বিধ্বস্ত, করভারের জুলুমে প্রপীড়িত গরীব বাঙ্গালী সর্ব্বস্ব খুইয়েও খাজনা দিতে বাধ্য হয়। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দের (বাংলা ১১৭৬) মন্বন্তর তারই পরিণাম। বাংলার প্রায় এক তৃতীয়াংশ মানুষ এই দুর্ভিক্ষে প্রাণ হারায়।

সন্ন্যাসী বিদ্রোহ

'আনন্দমঠ' উপন্যাসের অন্যতম নায়ক সন্ন্যাসী ভবানন্দ মহেন্দ্রকে যা বলছেন তা বস্তুতঃ বঙ্কিম চন্দ্রেরই বক্তব্য। বলছেন—"কোন্ দেশের এমন দুর্দ্দশা? কোন্ দেশের মানুষ খেতে না পেয়ে ঘাস খায়, কাঁটা খায়, বনের লতা খায়? কোন্ দেশের মানুষ শিয়াল-কুকুর খায়? মরা খায়? কোন্ দেশের মানুষের সিন্দুকে টাকা রাখিয়া সোয়াস্তি নাই, ঘরে ঝি-বৌ রাখিয়া সোয়াস্তি নাই, ঝি-বৌয়ের পেটে ছেলে রাখিয়া সোয়াস্তি নাই, পেট চিরে ছেলে বার করে? সকল দেশের রাজার সঙ্গে রক্ষণাবেক্ষণের সম্বন্ধ। আমাদের মুসলমান রাজা রক্ষা করে কই? ধর্ম্ম গেল, জাতি গেল, মান গেল—এখন তো প্রাণ পর্য্যন্ত যায়। এ নেশাখোর নেড়েদের না তাড়াইলে কি হিন্দুর হিন্দুয়ানী থাকে?" শুধু মুসলমান নয়, দেওয়ান ইংরাজও তখন প্রজা শোষণ করছে পুরোদমে।

বাংলার হিন্দুর যখন এই রকম অর্থনৈতিক বিপর্য্যয় এবং ধর্ম্মীয় সঙ্কট, তখন সেই বেদনা বিপ্লব সৃষ্টি করে একদল স্বদেশভক্ত ও স্বধর্ম্মপ্রেমী সন্ন্যাসীর কাতর অন্তরে। ইহাই ১৭৭০ খৃষ্টাব্দের ইতিহাস স্বীকৃত সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ। তাঁরা শুধু ইসলামের অপশাসনের অবসানই চান নি, তাঁরা চেয়েছেন বিদেশী শোষক ইংরাজের বিতাড়নও, প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন হিন্দুরাষ্ট্র। কিন্তু হিন্দু কই? কই হিন্দুর ভিতরে ঐক্য ও শক্ত সংগঠন? গুটি কতক বিদ্রোহী সন্ন্যাসী "বন্দে মাতরম্" ধ্বনিতে গলা ফাটিয়েছেন। সেই গর্জ্জন কোটি কোটি নিপীড়িত, নিরন্ন, শোষিত হিন্দুর চেতনাকে কাঁপিয়ে তুলতে পারে নি। ফলে বিদ্রোহ হয় ব্যর্থ। বিপন্নেরা ইসলামের পীড়ন থেকে মুক্তি খুঁজেছে নিজেদের শক্তিতে নয়, শোষক ইংরাজের আশ্রয়ে। কবীন্দ্র

রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

বঙ্গ তারে গঙ্গোদকে অভিষিক্ত করি
নিল চুপে চুপে।
বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল পোহালে শর্ব্বরী
রাজদণ্ড রূপে।

বৃটীশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এ দেশে এসেছিল ব্যবসা করতে। দেশের ভেদ ও অনৈক্যের সুযোগ নিয়ে ফেঁদে বসে রাজত্ব। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের পর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাত থেকে ভারতের সম্পূর্ণ শাসন ভার গ্রহণ করেন রাণী ভিক্টোরিয়া। সেই ইংরাজী ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে ইংরাজের জয় থেকে ধরে ১৯৪৭ সাল পর্য্যন্ত ১৯০ বৎসর পর্য্যন্ত ইংরাজ ভারতকে শাসন ও শোষণ ক'রে গেছে, আর ধর্ম্মান্তরিত করেছে লক্ষ লক্ষ হিন্দুকে। সে কাহিনী আসছে পরে।

অষ্টম অধ্যায়

ঊনবিংশ শতাব্দীর সংস্কার আন্দোলন

নবজাগরণের সূচনা

কোম্পানীর আমলেই এ দেশে প্রচলিত হয় ইংরাজী শিক্ষার। লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে ইংরাজী ভাষাকে ভারতের সরকারী ভাষারূপে ঘোষণা করেন। প্রস্তাবটি ছিল সুচতুর লর্ড ম্যাকলের। উদ্দেশ্য কেবল এদেশে শিক্ষার প্রসার নয়, পরন্তু এদেশের মানুষের মগজ ধোলাই করে তাদের পুরোপুরি পাশ্চাত্যীকরণ। তাদের চামড়াটা থাকবে কালো, কিন্তু খানা-পিনা, চিন্তা-ভাবনা, পোষাক-পরিচ্ছদ, আদব-কায়দায় তারা হবে ইংরাজ —গোল্লায় যাবে এদেশের সনাতন ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি। কাজটা শুরু

হয়েছিল বাংলাদেশ থেকেই। কিন্তু হোঁচট খেল সে উদ্দেশ্য। কারণ, ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই বঙ্গে এমন সকল প্রতিভাধর মনীষীর জন্ম, যাঁদের বিভিন্নমুখী অবদান সৃষ্টি করে নবজাগরণের এক প্রবল দুর্ব্বার তরঙ্গ। রাজা রামমোহন রায়, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র সেন, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, পরিব্রাজক স্বামী কৃষ্ণানন্দ, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, অক্ষয় কুমার দত্ত, রাজনারায়ণ বসু, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ, রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, শ্রীঅরবিন্দ, বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু, সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র, কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ, রসায়নাচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এবং এরূপ আরো বহু মহাত্মা আলোচ্য শতাব্দীকে ধন্য করেছেন। হিন্দুর সমাজক্ষেত্রেও এসেছে নব নব সংস্কার প্রচেষ্টা। এই সমাজ-সংস্কারকদের মতে ও পথে কিছু কিছু বিভিন্নতা থাকলেও সকলের উদ্দেশ্যই ছিল মহৎ এবং সময়োপযোগী। সে কথাই এখন বল্‌বো।

ইংরাজ-শাসনে ভারত

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের পর রাণী ভিক্টোরিয়া ভারতের শাসন ব্যবস্থা স্বহস্তে গ্রহণপূর্ব্বক ঘোষণা করেন যে, এদেশের মানুষের ধর্ম্মকর্ম্মে রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করবে না এবং তারাও পাবে ইংরাজের মতই সমান নাগরিক অধিকার। ইংরাজেরা তাঁদের দীর্ঘ শাসন কালে প্রকাশ্যে বর্ব্বরের ন্যায় হিন্দুর মন্দির ভাঙ্গে নি, নারীর ইজ্জৎ নষ্ট করে নি, হিন্দুর ঘর পোড়ায় নি, সম্পত্তি লুঠ করে নি, বরং তাঁরা এদেশে ন্যায় শাসনেরই প্রবর্ত্তক। কিন্তু তাঁদেরই মদতপুষ্ট খৃষ্টান মিশনারীরা যে অপকার্য্যে হাত পাকিয়েছিল তাও সত্য ও ভদ্রতার সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। ছলে বলে কৌশলে এ দেশের মানুষকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করাই ছিল তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। ওরা হিন্দুদের দেবদেবীর যথেচ্ছ কুৎসা গাইতো, হিন্দুর গুরু-গোঁসাইদের চরিত্র হনন করতো, হিন্দুশাস্ত্রের অপব্যাখ্যা দিত, এদেশের সরল, দরিদ্র, অশিক্ষিত, নিরুপায় হিন্দু ও উপজাতীয়দের বুঝাতো তারা হিন্দু-সমাজে কিরূপ উপেক্ষিত, বঞ্চিত, অবহেলিত। অর্থের প্রলোভনে

এবং আরো নানা অসৎ উপায়ে তাদিগকে প্রতারিত করে অবশেষে খেয়ে দিত তাদের পিতৃপুরুষের ধর্ম্মটা। বিখ্যাত নৃতত্ত্ববিৎ Dr. Verrier Elwin, D. Sc, F. N. I, F. R. A, মহোদয় Religious Banditry গ্রন্থে খৃষ্টান মিশনারীদের কুকীর্ত্তির যে বিস্তৃত চিত্র তুলে ধরেছেন তার রূপটি অতি কদর্য্য। তারা গোণ্ডা প্রভৃতি উপজাতীয়দের নেতাদের নেশা খাইয়ে টাকা ঘুস দিয়ে মিশনের দালালি কার্য্যে নিয়োগ করেছে এমন ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী Dr. Elwin. মিশনারীদের এ সকল দুষ্কার্য্যের বিবরণ সঙ্ঘ থেকে প্রকাশিত "হিন্দু, হুঁসিয়ার" পুস্তকে প্রাপ্তব্য। ওরা মানুষকে বুঝাতো, যীশুই একমাত্র পরিত্রাতা। হিন্দুরা হীদেন—নরকে যাবে। ওরা কিন্তু মুসলমানের কাছে ঘেঁস্‌তো না। স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায়—"তারা আমাদের দেশে আসে—আমাদের পূর্ব্বপুরুষ, আমাদের ধর্ম্ম ও সমস্ত কিছুকে ঘৃণা ও তিরস্কার করতে। তারা মন্দিরের সামনে গিয়ে বলে—হে সাকারবাদীর দল তোমরা নরকে যাবে। কিন্তু তারা কোন মুসলমানের কাছে যেতে সাহস করে না। তাহলে তরবারি বেরিয়ে আসতে পারে। আর হিন্দুরা অত্যন্ত ঠাণ্ডা" ধর্ম্মান্তরিত হিন্দুরা কি হিন্দুধর্ম্মে ফিরে আসতে পারে? স্বামীজী বলেন—"নিশ্চয়ই তারা ফিরে আসতে পারে এবং তাদের ফিরে আসতে দেওয়া উচিত। হিন্দুধর্ম্ম থেকে একজন চলে যাওয়ার অর্থ একজন কমে যাওয়াই নয়, একজন শত্রু সৃষ্টি হওয়া।"

ইংরাজ যুগের পুনরুল্লেখপূর্ব্বক বলা যায়—তারা শাসন যেমন করেছে, এদেশকে শোষণও করেছে তেমনি। কিছু ভালর সঙ্গে মন্দের পরিসংখ্যানও অমেয়। বিশাল ভারতবর্ষে তাদের সাম্রাজ্য চিরস্থায়ী করতে তারা আশ্রয় গ্রহণ করে Divide and rule নীতি। হিন্দু-মুসলমানে ঝগড়া বাঁধাবার গোঁসাই ছিল ইংরাজ। সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারায় তার সূত্রপাত, আর বিদায়ের পূর্ব্বে দেশটাকে টুক্‌রো করে দিয়ে যাওয়ায় তার শেষ।

ওদের তালিকায় ভারতে আছে দু'টো জাতি—Muslim and non-Muslim। হিন্দু নামটাই দিল মুছে—হিন্দুরা হলো অমুসলমান।

আবার হিন্দুদের ভাগ করে দিল তিন ভাগে—বর্ণহিন্দু, তপশীলী হিন্দু এবং উপজাতীয় গোষ্ঠী। অথচ তপশীলী বা উপজাতীয়দের কল্যাণে কোন উল্লেখযোগ্য কাজই তারা করে নি। এদেশের সার্ব্বিক উন্নয়নে তাদের কোন মাথা ব্যথাই ছিল না। ভারতের রাজস্ব আদায়ের বিরাট অঙ্ক চলে যেতো ইংলণ্ডে। ওদের শোষণের বিরুদ্ধে যখন প্রতিবাদ উঠে, যখন স্বরাজ বা পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের জন্য আসমুদ্র-হিমাচল ভারত প্রকম্পিত, তখন সেই স্বাধীনতার সৈনিকদের উপর যে নির্ম্মম অত্যাচারের রোলার ইংরাজ চালিয়েছিল সেই কলঙ্কের ইতিহাসও মানুষ ভুলবে না। ইংরাজের আমলেই বাংলা ১৩৫০ সালে আর একটি ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে বাংলার বহু অসহায় মানুষকে অনশনে মরতে হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনায় ফিরে আসি। আমাদের মূল আলোচ্য হচ্ছে ঊনবিংশ শতাব্দীর নব জাগরণের দিনে এই দেশে হিন্দু-সমাজ সংস্কারের যে সকল উল্লেখযোগ্য আন্দোলনের ধারা এসেছিল তারই সংক্ষিপ্ত পর্য্যালোচনা এবং উচিত মূল্যায়ন। এ সকল আন্দোলনের প্রকৃতি একই ছিল না এবং হিন্দু-সমাজ-সংস্কার ক্ষেত্রে যে সকল সমস্যা জটিল সেগুলির স্থায়ী সমাধানও হয় নি। এদের ভিতরে কতকগুলি দেবীবর ঘটকের মেলবন্ধন প্রচেষ্টার মতই তাৎক্ষণিক এবং কতকগুলি এক করতে যেয়ে পথ হারিয়ে আর এক দিকে মোড় নেয়। তার জন্য বিতর্কের সৃষ্টিও হয়েছে। তৎসত্ত্বেও এই আন্দোলন পরম্পরা একেবারে নিরর্থক তা বলা উচিত নয়। যে সকল প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা এই সংস্কার আন্দোলনের পুরোধা তাঁরা নমস্য। তাঁদের পথ ধরেই অবশেষে এসেছে আমূল সংস্কারের যুগ-প্রয়াস। সেই আমূল সংস্কার কি ভাবে কার মধ্য দিয়ে এসেছিল সে প্রসঙ্গ আসবে এই রচনার উপসংহারে।

রাজা রামমোহন রায় ও সংস্কার আন্দোলন

ইংরাজ শাসনের কালে যে সকল মহাত্মা হিন্দু-সমাজ-সংস্কার

কার্য্যে আত্মনিবেদিত, তাঁদের ভিতরে রাজা রামমোহন রায়ের নামই সর্ব্বাগ্রে স্মরণীয়। রাজার কাল ১৭৭৪-১৮৩৩। রামমোহনের বড় কীর্ত্তি লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্কের সাহায্যে আইন ক'রে ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে সতীদাহ প্রথা নিরাকরণ। এ নিষ্ঠুর প্রথা চলছিল স্মৃতির বিধানের অযৌক্তিক দোহাই দিয়ে। আমরা পূর্ব্বেই দেখেছি, অঙ্গিরা ও পরাশর বচনে সহমরণের অতি প্রশংসা। কিন্তু স্মার্ত্ত রঘুনন্দন পরিষ্কার বলেছেন সহমরণ বাধ্যতামূলক নয়। ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালনই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। হিন্দুধর্ম্মে পাতিব্রত্য ধর্ম্মের প্রশংসা কীর্ত্তনের উদ্দেশ্যে অঙ্গিরা ও পরাশর এরূপ বচন বল্‌লেও পরাশরও কিন্তু বিধবার ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। সুতরাং, অনিচ্ছুকা সদ্যঃ বিধবাকে জবরদস্তি করে স্বামীর চিতায় বেঁধে সতী করা মানে স্পষ্টতঃ নরহত্যা। অন্ধবিশ্বাস অথবা কোন বৈষয়িক স্বার্থসিদ্ধির জন্যই এ রকম ঘটনা ঘটতো। রামমোহন এই অমানবিক প্রথা বন্ধ ক'রে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। রামমোহন খৃষ্টান পাদ্রীদের দ্বারা হিন্দুকে ধর্ম্মান্তরিত করার বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রামী। তিনি অর্থহীন জাতপাতের বিচার এবং অন্ধ কুসংস্কারের বিরুদ্ধেও সর্ব্বদাই লড়াই করেছেন। বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে তাঁর দান আছে। তাঁর ছিল অগাধ দেশপ্রীতি। ভারতীয় আধ্যাত্মিক ও ধর্ম্মীয় আদর্শকেই তিনি সর্ব্বোচ্চ স্থান দিয়েছেন, কিন্তু পাশ্চাত্য নীতিবাদকে তিনি স্থান দিয়েছেন ভারতীয় নীতিবাদেরও ঊর্ধ্বে। তার ভাবনায় ভারতের যথার্থ উন্নতি চাইলে পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানকে গ্রহণ করতেই হবে। তজ্জন্য এ দেশে ইংরাজী ভাষা শিক্ষা প্রচলনের সমর্থক ছিলেন রাজা।

রামমোহন একাধিক ভাষায় পারদর্শী। তাঁর ধর্ম্মনিষ্ঠাও ছিল। ইনি ব্রাহ্মধর্ম্মের আদি প্রবক্তা। ধর্ম্ম মতে তিনি শঙ্করের অদ্বৈতবাদ গ্রহণ করেন। কিন্তু বেদান্তের পাশাপাশি কোরান পাঠে কি তাঁর বুদ্ধিটা গুলিয়ে যায়? তিনি বেদান্তের অদ্বৈতবাদের সঙ্গে মুসলিমের একেশ্বরবাদকে এক ক'রে ফেলেন। অথচ দুই মতে ফারাক বিস্তর। কট্টর একেশ্বরবাদী হয়ে তিনি প্রচার আরম্ভ করেন হিন্দুর মূর্ত্তিপূজার বিরুদ্ধে। এখানেই রাজা পথহারা।

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র ও বিধবা বিবাহ

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এক স্মরণীয় ও বরণীয় নাম। তাঁর সময়কাল ১৮২০-১৮৯১। সংস্কৃত সাহিত্যে অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য ইনি বিদ্যাসাগর উপাধি লাভ করেন। আধুনিক বঙ্গভাষার জনকরূপে আজো তিনি খ্যাতিমান্। আমরা ছোট বেলার 'অ-আ, ক-খ' শিখেছি ঈশ্বরচন্দ্রের 'বর্ণপরিচয়' বই থেকে। তিনি একজন হৃদয়বান, দয়ার্দ্রচিত্ত, পরোপকারী, দরিদ্রে দাতা, সফল অধ্যাপক, পিতৃমাতৃভক্ত, স্বদেশপ্রেমী ও সমাজ-সংস্কারক। শেষোক্ত ভূমিকায় তিনি বাল-বিধবা বিবাহের প্রবর্ত্তক। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে কোম্পানী শাসনের আমলে ইনি ইংরাজ সরকারের সাহায্যে বাল-বিধবার পুনর্ব্বিবাহ আইন পাশ করান এবং দৃষ্টান্তস্বরূপ নিজের একমাত্র পুত্র নারায়ণকে বিবাহ দেন এক বাল-বিধবার সঙ্গে। এই ব্যাপারে রক্ষণশীল সমাজে প্রচণ্ড ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। শুরু হয় বাক্-বিতণ্ডা, বিরোধ, বিরোধিতা। কিন্তু সর্ব্বপ্রকার বাধা সত্ত্বেও এই দৃঢ়চেতা মানুষটি থাকেন নিজ কর্ম্ম-প্রয়াসে অবিচল।

প্রশ্ন জাগে—রক্ষণশীল বন্দ্যবংশীয় ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেও এবং সংস্কৃত সাহিত্যে শাস্ত্রবেত্তা হয়েও হঠাৎ তিনি কেন বাল বিধবার পুনর্ব্বিবাহ আন্দোলনে মরিয়া হয়ে উঠলেন? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হলে আমাদিগকে দেবীবর ঘটকের মেলবন্ধ বিধানের সময় কালে আবার পিছিয়ে যেতে হবে। দেবীবর কুলীনদের ভ্রষ্টতার দশা দেখে দোষে দোষে মিলিয়ে মেলবন্ধ ক'রে ভ্রষ্ট কুলীনদের কুল নির্ণয় করেছিলেন। নিয়ম বেঁধে দিয়েছিলেন 'প্রকৃতি' ও 'পালটী' মেল ব্যতীত কুলীনদের ভিতরে বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপন করা যাবে না। এই নিয়ম ভঙ্গ করলে কুল নষ্ট হবে।

এই জাতীয় তাৎক্ষণিক বিধান চিরদিন সমাজে কল্যাণকর হয় না। কারণ, সমাজের আছে এক নিজস্ব শাশ্বত গতিময়তা। তাই তাৎক্ষণিক বিধানের এমনই চরিত্র যে, আজ যা উপযোগী, কাল তা-ই হয়ে দাঁড়ায় তদ্বিপরীত। প্রাক্ কথিত কুলীন সমাজে ছেলের

অপেক্ষা মেয়ের সংখ্যা অধিক। ফলে কুলরক্ষার দায়ে এক বরের বহু বিবাহ প্রচলিত হয়। এর পরিণাম হয়ে দাঁড়ায় অতি ভয়াবহ। ঈশ্বরচন্দ্র এই করুণ চিত্রের প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা।

বর্ত্তমান সমাজের ইতিহাস গ্রন্থ থেকে জানা যায়, একমাত্র হুগলী জেলা থেকেই ঈশ্বরচন্দ্র নিম্নোক্ত পরিসংখ্যান সংগ্রহ করেন। যথা :—

ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়, বয়স ৫৫, বিবাহ ৮০টি, রঘুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বয়স ৪০, বিবাহ ৩০টি, ২০ বৎসরের যুবা দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই বয়সেই ১৬টি কন্যার স্বামী, পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বয়স ৫৫, বিবাহ ৬১টি, ১৮ বৎসরের তরুণ আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় ইতোমধ্যেই ১১টি বিবাহ সেরে ফেলেছে, যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২২ বৎসর বয়সেই ১৫টি কন্যার পরম পতি, বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বয়স ৬০, বিবাহ ৫০টি, ভগবান্ চট্টোপাধ্যায়, বয়স ৬৪, বিবাহ ৭২টি, রামময় মুখোপাধ্যায়, বয়স ৫০, বিবাহ ৫০টি।

কুলরক্ষার তাগিদে ৮০ বৎসরের বৃদ্ধের সঙ্গে ৫ বৎসরের নাবালিকার বিবাহেও বাধা ছিল না। ফলে ব্যাপার কি দাঁড়ায়? এক এক বরের মৃত্যুতে অগণিত নিষ্পাপা কন্যার বৈধব্য বরণ। বিবাহ সম্বন্ধে যাদের কোন জ্ঞানই হয়নি তারাও হলো পতিহীনা। যৌবন উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে দেখলো তারা পোড়াকপালী। এই সুন্দর জগতে হাহাকার ব্যতীত তাদের প্রাপ্য আর কিছুই নেই। এর ফলে নৈতিক ভ্রষ্টতা আসাও স্বাভাবিক। এই মর্ম্মঘাতী বেদনাই করুণার্দ্রহৃদয় ঈশ্বরচন্দ্রকে বিমথিত করে। কিন্তু সমাধান কোথায়?

খুঁজে পেতে তিনি উদ্ধার করেন পরাশরের বচন। "নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ। পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে।।" (৪।২৬) অর্থাৎ, পতি যদি নিরুদ্দেশ হয়, মরে যায়, সন্ন্যাস গ্রহণ করে, ক্লীব প্রতিপন্ন হয় বা চরিত্রদোষে পতিত হয়, তবে এই পঞ্চপ্রকার আপদে কন্যার পত্যন্তর গ্রহণ বিহিত। পরাশরের পরবর্ত্তী দুটি বচনে (৪।২৭-২৮) কিন্তু বিধবার ব্রহ্মচর্য্য পালন,

এমন কি সহমরণের প্রশংসা।* সুতরাং, 'নষ্টে মৃতে' ইত্যাদি বচনের সঙ্গত অর্থ বাগ্‌দত্তা কন্যার ভাবী পতির সম্বন্ধেই মাত্র প্রযোজ্য, বিবাহান্তর পতির সম্বন্ধে নয়। কিন্তু বিদ্যাসাগর স্বমতে থাকেন সুদৃঢ়। তৎসত্ত্বেও ঈশ্বরচন্দ্রের উক্ত বিধান হিন্দুসমাজে ব্যাপক স্বীকৃতি পায় নি। কালে কুলীনের বহু বিবাহ বন্ধ হয়। ফলে বাল-বিধবা বিবাহের তাগিদও ফুরায়।

বিধবা বিবাহ প্রণবানন্দের অভিপ্রেত নয় কেন?

স্বামী বিবেকানন্দ বিধবা বিবাহ সমর্থন করেন নি, স্বামী প্রণবানন্দও নয়। বিংশ শতাব্দীতেও কোন কোন ভ্রান্তবুদ্ধি সংস্কারক বিধবা বিবাহ প্রচলনে প্রচাররত দেখে স্বামী প্রণবানন্দ বলেন— "বিধবা বিবাহ প্রচলন করা মানে হিন্দুর বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে কুঠারাঘাত করা। জীবদ্দশায় কোন স্ত্রী যদি চিন্তার সূচনা পায় যে, বর্ত্তমান স্বামী গত হলে সে অন্য কোন অভিপ্রেত পুরুষের সঙ্গে পুনর্বিবাহিতা হবার সুযোগ পাবে, তবে সে গৃহে কি শান্তি থাকতে পারে? এমন কোন্ হিন্দু আছে যে, সে তেমন মাকে প্রাণ খুলে 'মা' ডেকে শান্তি পাবে? যদি কেউ থাকে তবে সে বুকে হাত দিয়ে স্বীকার করুক। আর তেমন স্ত্রীকে কোন্ স্বামী অকপট বিশ্বাসে ঘরের সিন্দুকের চাবিকাঠি হাতে দিবে? এ তো ঘরে ঘরে আগুন জ্বলে উঠবে। এতে লাভ হবে এই যে, হিন্দুর গার্হস্থ্য জীবনে যে শান্তি-শৃঙ্খলাটুকু অদ্যাপি বিদ্যমান, তাও আর থাকবে না। পারস্পরিক অবিশ্বাসে পূর্ণ হয়ে উঠবে সংসার।"

এমন দৃপ্ত ও সুস্পষ্ট নীতির ঘোষণা ইতঃপূর্ব্বে আর কোন মহাত্মা করেছেন কি না জানি না। ধনকুবের যুগল কিশোর বিড়লা

---

* মৃতে ভর্ত্তরি যা নারী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।
সা মৃতে লভতে স্বর্গং যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ।। ৪।২৭
তিস্রঃ কোটোর্দ্ধকোটী চ যানি রোমাণি মানবে।
তাবৎ কালং বসেৎ স্বর্গং ভর্ত্তারং যানুগচ্ছতি।। ৪।২৮

একদা প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে, শুদ্ধি ও বিধবা বিবাহের কাজ করলে তিনি প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান দিবেন। সঙ্ঘাচার্য্য এই প্রস্তাব তৎক্ষণাৎ প্রত্যাখ্যান করেন। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে বিধবার ব্রহ্মচর্য্য পালনই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। বিধবা বিবাহ ব্যাপকতা লাভ করলে লক্ষ লক্ষ অনূঢ়া বৃষলী কন্যার বিবাহ কি সমস্যা-সঙ্কুল হয়ে উঠবে না? বস্তুতঃ ঈশ্বরচন্দ্রের বিধবা বিবাহ আন্দোলনও ছিল এক তাৎক্ষণিক সমস্যার সমাধানের আশু প্রয়াস মাত্র।

হিন্দুচেতনার উন্মেষে ঊনবিংশ শতাব্দীর কিছু ধর্ম্মীয় সাহিত্য

আলোচ্য শিরোনামার আলোচনায় ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র, নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ ভূদেব মুখোপাধ্যায়, এমন কি ব্রাহ্মমতাবলম্বী রাজনারায়ণ বসু এবং অক্ষয় কুমার দত্তের নামও উল্লেখ্য। ধর্ম্মীয় বিষয়ক এদের রচনা ও গ্রন্থাবলী পাশ্চাত্য প্রভাব থেকে হিন্দুকে মোহমুক্ত করতে যথেষ্ট সহায়ক হয়।

বন্দে মাতরম্ মন্ত্রের উদগাতা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রসঙ্গ পূর্ব্বেই কথঞ্চিত আলোচিত হয়েছিল। সন্ন্যাসী বিদ্রোহের উপর "আনন্দ মঠ" উপন্যাস রচনা কালে সন্ন্যাসী সত্যানন্দ, ভবানন্দাদির কণ্ঠে যে 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্র উচ্চারণ করিয়েছিলেন, হিন্দুরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সঙ্কল্পবদ্ধ সেই সন্ন্যাসী বিদ্রোহ সফল হয় নি। কিন্তু এই মন্ত্রই পরবর্ত্তীকালে স্বদেশী আন্দোলনে উদ্দাম অনুপ্রেরণা সঞ্চার করে, কাঁপিয়ে তুলে আসমুদ্রহিমাচল সমগ্র ভারতকে। পরিতাপের বিষয় —সংখ্যালঘু মুসলমানদের তীব্র বিরোধিতায় সেই সঙ্গীত ছাঁটাই হয়ে যায়—রাখা হয় তার ভিতরের ভৌগোলিক অংশটুকু মাত্র। দেশ-জননী আর "ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী" রইলেন না। সেই দিনই সূচিত হলো ভারত মাতার অঙ্গচ্ছেদ অতি আসন্ন।

ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক রূপে বঙ্কিমের যশোভাতি চির ভাস্বর। কিন্তু তিনি শুধু ঔপন্যাসিক নহেন, তিনি স্বদেশপ্রেমিক ও স্বধর্ম্মপ্রেমিক। তদ্বিরচিত 'শ্রীকৃষ্ণচরিত' একখানি যুক্তিনিষ্ঠ উপাদেয় গ্রন্থ। শ্রীকৃষ্ণকে তিনি ঈশ্বরাবতার রূপে বিচার করেন নি—তুলে

ধরেছেন তাঁর নিষ্কলঙ্ক আদর্শ মহামানবরূপটি। শ্রীকৃষ্ণচরিত্র সম্বন্ধে বিতর্কিত বিষয়গুলি তিনি খণ্ডন করেন নানা যুক্তি ও প্রমাণ-প্রয়োগে। এতে শ্রীকৃষ্ণকে যাঁরা ঈশ্বরাবতার বা স্বয়ং ঈশ্বররূপে ভজনা করেন তাঁরাও পাবেন এমন এক ভাগবত পুরুষ যাঁর চরিত্র মানুষের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে নয়। অদ্বিতীয় আদর্শ পুরুষের চরিত্রানুধ্যানে দেশে লক্ষ লক্ষ আদর্শ মানুষ তৈরী হোক, বাস্তব সমাজ-জীবনে সেটিও তো এক দুর্ল্লভ প্রাপ্তি। নিখুঁত মানুষই দেবতা হয়। দেবত্ব থেকেই তো ঈশ্বরত্বে উত্তরণ।

বঙ্কিম রচিত "ধর্ম্মতত্ত্ব" বঙ্গসাহিত্যে একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ সুখ কি? দুঃখ কি? ধর্ম্ম ও মনুষ্যত্ব কি? ভক্তি ও ভক্তির ঐহিক উদ্দেশ্য কি? ভগবদ্‌গীতার মর্ম্ম কি? ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন গুরুশিষ্যের্ প্রশ্নোত্তরচ্ছলে। শ্রীগীতার নিষ্কাম কর্ম্মযোগের অমেয় প্রশংসা কীর্ত্তিত হয়েছে এই গ্রন্থে। হিন্দুদর্শন ও ইয়ুরোপীয় দর্শনের তুলনামূলক আলোচনার দ্বারা তিনি হিন্দুধর্ম্মের মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিপাদক। বঙ্কিমচন্দ্রের কাল ১৮৩৮-১৮৯৪।

নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহোদয়ও বঙ্কিমের সামসময়িক (১৮২৫-১৮৯৪)। ভূদেবের রচিত 'আচার প্রবন্ধ', 'পারিবারিক প্রবন্ধ' ও 'সামাজিক প্রবন্ধ' গ্রন্থত্রয়ে আর্য সনাতন ধর্ম্মের সদাচার, পবিত্রতা, সন্নীতি, গার্হস্থ্য ও সামাজিক কর্ত্তব্যনিষ্ঠার বিষয় সবিস্তারে আলোচিত। কিরূপে চললে সংসারের অশান্তি দূর হয়, শান্তির আবির্ভাব ঘটে, কিরূপে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করলে সমাজে ও ধর্ম্মে পতন ঘটে না—ভূদেবের এ সকল তত্ত্ব বড় উপাদেয়। বাঙ্গালীর পাশ্চাত্য-প্রীতিকে তিনি করেছেন তিরস্কার, শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন হিন্দুর সমাজ-দর্শনকেই।

রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-১৯০০) ধর্ম্ম মতে ব্রাহ্ম হয়েও ছিলেন হিন্দুচেতনানিষ্ঠ। "ধর্ম্মতত্ত্ব-দীপিকা" ও "ধর্ম্মতত্ত্ববিবেক" গ্রন্থে তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের তত্ত্বেরই প্রবক্তা। কিন্তু "হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব" গ্রন্থে পৃথিবীর অন্যান্য ধর্ম্ম থেকে যে হিন্দুধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ বহু শাস্ত্রপ্রমাণদ্বারা তিনি তা প্রতিপাদন করেছেন। তিনি এ কথাও স্বীকার

করেছেন যে হিন্দুধর্ম্ম থেকে ব্রাহ্মধর্ম্ম অভিন্ন। তাঁর "সেকাল ও একাল" গ্রন্থখানি সামাজিক মূল্যায়নে অতুলনীয়। পূর্ব্বে মানুষের জীবন কেমন সরল, সহজ, হৃদ্যতাপূর্ণ ছিল, আর একালে তার বিপরীত। কেন এমনটি হলো, তার বিশ্লেষণও রয়েছে এই গ্রন্থে। এ গ্রন্থ সমাজ-বিবর্ত্তনের এক স্মরণীয় ইতিহাস।

রাজনারায়ণের ন্যায় অক্ষয় কুমার দত্তও (১৮২১-১৮৮৭) ছিলেন ব্রাহ্মমতাবলম্বী। তিনি বেদকে অভ্রান্ত ব'লে মেনে নিতে পারেন নি। কিন্তু তদ্বিরচিত "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়" গ্রন্থখানি হিন্দুধর্ম্মের সাহিত্যভাণ্ডারে এক অমূল্য সম্পদ। এই গ্রন্থে হিন্দুধর্ম্মের বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, গাণপত্য ও সৌর প্রভৃতি উপাসক সম্প্রদায়ের বিবরণ, তাদের বিস্তৃত তালিকা এবং ঐ সকল সম্প্রদায়ের ভিতরে যে সকল ভেদাভেদ, তা অবান্তর ব'লে তিনি বিবেচনা করেন। উপক্রমণিকায় দেখিয়েছেন হিন্দুজাতির ভিতরে কিরূপে বৈদিক ধর্ম্মের প্রচলন হয় এবং কি উপায়েই বা বৈদিক ধর্ম্মের পর পৌরাণিক ও তান্ত্রিক ধর্ম্মের বিবর্ত্তন ঘটে। যথেষ্ট পাণ্ডিত্যের সঙ্গে গবেষণাধর্ম্মী এই গ্রন্থখানি রচিত। অক্ষয় দত্তের আর একখানি গ্রন্থ "ধর্ম্মনীতি।" ধর্ম্মপ্রবৃত্তি, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয়, গার্হস্থ্য ধর্ম্ম, আত্মবিষয়ক কর্ত্তব্য কর্ম্ম, স্বামী-স্ত্রীর পরস্পর ব্যবহার, সন্তানের প্রতি মাতাপিতার কর্ত্তব্য, আবার মাতাপিতার প্রতি সন্তানের কর্ত্তব্য, প্রভু-ভৃত্য সম্বন্ধ এ সকল বিষয় নিয়েই গ্রন্থের বিস্তার। আমরা দেখেছি, রাজা রামমোহনও হিন্দুধর্ম্মের আধ্যাত্মিকতাকেই শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, কেবল নীতিবাদের প্রশ্নে তিনি ছিলেন পাশ্চাত্যপ্রেমী, জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন হিন্দুর মূর্ত্তিপূজার বিরুদ্ধে, যা হিন্দুরা গ্রহণ করে নি।

ঊনবিংশ শতাব্দীর কবি ও সাহিত্যিকদিগের পর্য্যায়ে আরো বহু মনীষীর নাম মনে পড়ে। মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-৭৩) খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক প্রথমে ইংরাজী ভাষায় কবিতা রচনা আরম্ভ করেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সাফল্যের আশা কম বিবেচনা ক'রে তাঁর চেতনা জাগে। "আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়" কবিতায়

সেই আক্ষেপ। তিনি কুক্ষণেই পরদেশে ভিক্ষাচরণে ব্রতী। নিজের ঘরেই তো কত "রতনের রাজি।" কমল-কানন ভুলে তিনি শৈবালদল নিয়ে খেলায় কেন মত্ত থাকবেন? না, আর নয়। ভারতের পৌরাণিক উপাখ্যান ও মহাকাব্যের রসমাধুর্য্য আকর্ষণ করে মধুসূদনকে। রচনা করেন তিনি মেঘনাদবধ কাব্য, ব্রজাঙ্গনা কাব্য, তিলোত্তমাসম্ভব ও শর্ম্মিষ্ঠা নাটক। কালীপ্রসন্ন সিংহের (১৭৮০-৮৮) মহাভারতের কাব্যানুবাদ এই শতাব্দীর সাহিত্য ভাণ্ডারে এক অমূল্য সম্পদ। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৩৮-১৯১৭) বৃত্রসংহার কাব্য ও দশমহাবিদ্যাকাব্য, নবীন চন্দ্র সেনের (১৮৪৭-১৯০৯) রৈবতক, কুরুক্ষেত্র, প্রভাস প্রভৃতি কাব্য ঊনবিংশ শতাব্দীরই স্মরণীয় সাহিত্যকর্ম্ম। নবীন সেন গীতা ও চণ্ডীর বঙ্গানুবাদও করেন। এই সকল কাব্য ও সাহিত্যগ্রন্থের প্রভাব তৎকালে সমাজ-জীবনে গভীর রেখাপাত করবে তা বলাই বাহুল্য।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও ব্রাহ্মসমাজ

ঊনবিংশ শতাব্দীতে আর এক সংস্কারের ধারা এসেছিল ব্রাহ্মসমাজের মধ্য দিয়ে। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে রাজা রামমোহন রায় ব্রহ্মসভার সংস্থাপক। কিন্তু তিনি এই মতবাদের কোন সাংগঠনিক রূপ দিয়ে যান নি। এই ব্রহ্মসভারই বিবর্ত্তিত রূপ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রবর্ত্তিত আদি ব্রাহ্মসমাজ। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে তিনি তত্ত্ববোধিনী সভা গঠন করেন। হিন্দুধর্ম্মের ব্রহ্মপ্রতিপাদক তত্ত্বসমূহই মাত্র এই সভার মুখ্য প্রচার্য্য। রামমোহনের ন্যায় দেবেন্দ্রনাথ কিন্তু উপনিষৎ শাস্ত্রকে পুরোপুরি গ্রহণ করেন নি। আপন মত ও পছন্দের সঙ্গে মিলে কেবল সেই সকল উপনিষদের মন্ত্রাবলী নিয়েই দেবেন্দ্রনাথ প্রবর্ত্তন করেন ব্রাহ্মমতের। এই মতবাদে বর্ণাশ্রম বা বর্ণাশ্রমবিহিত ক্রিয়াকাণ্ডের স্বীকৃতি নেই, জাতিধর্ম্মগত ভেদাভেদ নেই, মূর্ত্তিপূজা নেই, শ্রাদ্ধকৃত্য নেই, এমন কি অবশেষে বেদের অপৌরুষেয়তা ও অভ্রান্ততাও ব্রাহ্মেরা বর্জ্জন করেন। পণ্ডিতেরা বলেন—মহর্ষি প্রকৃত পক্ষে অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপীয়

যুক্তিবাদের উপরই তদীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা দিতে চেয়েছেন। কিন্তু অধিক দিন এই সংস্থা নিজেদের ঐক্য রক্ষা করতে পারে নি। আচার্য্য কেশব সেনের সহিত মতানৈক্য ঘটায় শিবনাথ শাস্ত্রী, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্রাহ্মেরা পৃথক্ এক সাধারণ 'ব্রাহ্মসমাজ' গঠন করেন। অতঃপর ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে আচার্য্য কেশব সেনও আদি ব্রাহ্মসমাজ' ত্যাগপূর্ব্বক গঠন করেন 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ', আপন মত পরিবর্ত্তিত হওয়ায় এই কেশব সেনই আবার জন্ম দেন 'নববিধান'-এর এক নব ধর্ম্মমত। টুক্‌রো হয়ে যান ব্রাহ্মেরা। কেন এমন দশা ঘটে? কারণ, ব্রাহ্মমতের উদ্ভব ও বিবর্ত্তনের মূলে ছিল কিছু শিক্ষিত ও অভিজাতের বুদ্ধির ব্যায়াম —কোন তপঃ-প্রভাবজনিত ব্রহ্মোপলব্ধি নয়। ঋষিধারা থেকে সরে গিয়ে কোন মতলবের ধর্ম্মই যে ভারতে টিকে থাকতে পারে না, ব্রাহ্মধর্ম্মে ভাঙ্গন তার অন্যতম দৃষ্টান্ত। বেদের অপৌরুষেয়তা বর্জ্জনপূর্ব্বক কার্য্যতঃ ব্রাহ্মেরা হিন্দুধর্ম্মের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। পরবর্ত্তী কালে কবি রবীন্দ্রনাথ অবশ্য স্বীকৃতি দেন যে ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মেরই অঙ্গ।

ব্রাহ্মধর্ম্মের ইতিবাচক উপযোগিতা সম্বন্ধে পণ্ডিতদের অভিমত এই যে, ডিরোজিওর মগজ ধোলাইয়ের খপ্পরে পড়ে একদল ইংরাজী শিক্ষিত নব্য যুবা যখন স্বাধীনচিন্তা ও প্রগতির নামে মদ্যপ, নিষিদ্ধভোজী, স্বধর্ম্মবিরাগী হয়ে অবশেষে খৃষ্টধর্ম্মের দিকে ঝুঁকে পড়ছিল, সেই সময়ে নিরাকার ব্রহ্মবাদী, পৌত্তলিকতাহীন, অনুষ্ঠান বাহুল্যবর্জ্জিত ব্রাহ্মধর্ম্মের ভিতরে তারা খুঁজে পায় বিকল্প আশ্রয়। তা না হলে মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ন্যায় আরো অনেক প্রতিভাধর বঙ্গসন্তানকে হয়তো আমাদের হারাতে হতো।

এ কথা মেনে নিলেও রাজা রামমোহন রায়ের সময় কাল থেকেই হিন্দু-জনসাধারণ যে ব্রাহ্মমতকে ভাল চোখে দেখে নি, তার জ্বাজ্জল্যমান প্রমাণ একটি ব্যঙ্গাত্মক ছড়া গান। সে গানের লক্ষ্য ছিল রাজা।

সুরাই মেলের কুল,
বেটার বাড়ী খানাকুল,
বেটা সর্ব্বনাশের মূল,
ওঁ তৎসৎ ব'লে বেটা
বানিয়েছে স্কুল।

এই ছড়া তৎকালে হাটে, মাঠে, ঘাটে, এমন কি সাধারণ স্কুলের ছাত্রদের কণ্ঠেও গীত হতো। পরিষ্কার বলা যায়, ব্রাহ্মেরা হিন্দুসমাজের ভিতরে কোন অনুকূল প্রভাবই বিস্তার করতে পারেন নি, ব্যর্থ হয়েছেন সমাজের আমূল সংস্কারে, নিজেরাই হয়ে গেছেন হিন্দুসমাজে 'একঘরে'।

দয়ানন্দ সরস্বতী ও আর্য্যসমাজ

ইনি কাঠিওয়াড় প্রদেশের লোক। এক শৈবধর্ম্মী পরিবারে ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে জন্মলাভ পূর্ব্বক ইনি ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। সুতরাং, ইনিও ঊনবিংশ শতাব্দীর একজন খ্যাতিমান্ ধর্ম্ম-সংস্কারক ও সমাজ সংস্কারক। বাংলায় যখন ব্রাহ্মসমাজ ধর্ম্মের আন্দোলন চলছে, তখন তার পাশাপাশি বাংলার বাইরে দয়ানন্দের আর্য্য-সমাজের সমুত্থান। ব্রাহ্মদের চেয়েও অনেক অধিক শক্তির প্রচণ্ডতা নিয়ে এই আন্দোলনের সূচনা এবং ব্যাপ্তিও ঘটেছিল ভারতের নানা প্রদেশে। ইনি কলিকাতায়ও এসেছিলেন এবং রাজা স্যার শৌরীন্দ্র মোহন ঠাকুরের "প্রমোদ কানন" উদ্যানে কিছু দিন অবস্থান পূর্ব্বক বহু বাঙালী ও শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদিগের সহিত মিলিত হয়ে স্বীয় মত ব্যক্ত করেছিলেন।

আর্য্য-সমাজের মতবাদ বেদভিত্তিক। দয়ানন্দ বেদের মন্ত্রভাগকে ঈশ্বরবাক্যরূপে গ্রহণ করেন। উপনয়ন ও বিবাহাদি সংস্কার ব্যাপারে আর্য্যসমাজীরা বেদানুগামী। ওঁরা নিত্য অগ্নিহোত্রী। বৈদিক গুরুকুল শিক্ষাব্যবস্থা পুনঃ প্রবর্ত্তনে এই সম্প্রদায়ের আগ্রহ দেখা যায়। আর্য্যসমাজীরা গোহত্যার প্রতিবাদী। কিন্তু মূর্ত্তিপূজা মানেন না। মৃতের প্রতি কর্ত্তব্য অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পর্য্যন্ত। অতঃপরঃ স্মৃতিপ্রোক্ত

শ্রাদ্ধকর্ম্ম নেই। অস্পৃশ্যতা ও অনাচরণীতার কুসংস্কারকে এই মতবাদ স্থান দেন নি। আর্য্যসমাজীরা বিধবা বিবাহের পক্ষপাতী। ইচ্ছুক মুসলমান ও খৃষ্টান শুদ্ধি অন্তে আর্য্যসমাজে স্থান পাবে। "সত্যার্থ প্রকাশ" গ্রন্থে দয়ানন্দ হিন্দুদের মূর্ত্তিপূজা ও অবৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড যেমন খণ্ডন করেছেন, বলিষ্ঠ যুক্তিদ্বারা তেমনি মুসলমান ও খৃষ্টানের ধর্ম্মমত খণ্ডনপূর্ব্বক বেদবাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনে চেষ্টিত হয়েছেন। দয়ানন্দ 'হিন্দু' নামটি মানেন না, কারণ বেদে 'হিন্দু' শব্দের উল্লেখ নেই। 'হিন্দু' নাম মুছে ফেলে 'আর্য্য' নামের প্রচলন তাঁর অভিপ্রেত। মূলতঃ এমন কিছু কারণে আর্য্যসমাজীরাও ব্রাহ্মদের মত হিন্দুসমাজের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বতন্ত্র এক সম্প্রদায়ে পরিণত হন। বঙ্গে আর্য্যসমাজীরা কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেন নি। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আবির্ভাব সমকালে। স্বামী বিবেকানন্দের দৃপ্ত ঘোষণা—"ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর।"

পরিব্রাজক স্বামী কৃষ্ণানন্দ

ব্রাহ্মধর্ম্ম ও খৃষ্টধর্ম্মের অভ্যুত্থানে হিন্দুধর্ম্ম যখন বিপন্ন, সেই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে আর একজন শক্তিশালী হিন্দুসন্ন্যাসীর আবির্ভাবও শ্রদ্ধার সহিত স্মরণীয়। তিনি পরিব্রাজক স্বামী কৃষ্ণানন্দ (১৮৪৯-১৯০২)। অর্থাৎ, তিনি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশব সেন. দয়ানন্দ সরস্বতী, স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতির ন্যায় মহাত্মাদের সামসময়িক। তিনি ছিলেন নির্ভেজাল সনাতনী। তাই তাঁর গ্রন্থ 'শ্রীকৃষ্ণ-পুষ্পাঞ্জলি', 'পরিব্রাজকের বক্তৃতা' প্রভৃতি এবং তাঁর লেখা 'দীনবন্ধু করুণাসিন্ধু' 'প্রণমামি পরব্রহ্ম' প্রভৃতি সঙ্গীত সঙ্ঘনেতা স্বামী প্রণবানন্দের অতিশয় সমাদরের বস্তু হয়েছিল।

চতুর্দ্দিকে সনাতন ধর্ম্মের অবক্ষয় কৃষ্ণানন্দকে অত্যন্ত ব্যথিত করে। তিনি মুঙ্গেরে প্রথম গঠন করেন "আর্য্যধর্ম্ম-প্রচারিণী সভা।" অতঃপর নানা স্থানে ধর্ম্মসভা, হরিসভা, সুনীতি সঞ্চারিণী সভা, সংস্কৃত বিদ্যালয় গঠন তদীয় অমর কীর্ত্তি। তৎসম্পাদিত 'ধর্ম্মপ্রচারক' মাসিক পত্রিকা হিন্দী ও বাংলা ভাষায় অন্ততঃ পঁচিশ

বৎসর চলেছিল। কৃষ্ণানন্দের গীতার ভাষ্য এক অমূল্য সম্পৎ। রাম-গীতা, পরমার্থসার, মণিরত্নমালা, যোগ ও যোগী প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতাও তিনি। হিন্দী ও বঙ্গভাষায় সনাতন ধর্ম্মের প্রচারের জন্য অসাধারণ বাগ্মী কৃষ্ণানন্দজী কলিকাতা, ঢাকা, ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট, কাছাড়, কুচবিহার, শিলং, মিরাট, কাশী, গয়া, প্রয়াগ, ছাপরা, গাজিপুর, লাহোর, দিল্লী, শিমলা, জলন্ধর, পেশোয়ার—ভারতের বহু স্থানে পরিভ্রমণ করেন। কলিকাতার এলবার্ট হলে 'ভারতের মূর্চ্ছাভঙ্গ' ভাষণ বিদ্বজ্জনের অশেষ প্রশংসা অর্জ্জন করে। কৃষ্ণানন্দের বাগ্মিতা শক্তি এতই উচ্চাঙ্গের যে মুঙ্গেরের পাদ্রী রেভারেণ্ড ইভন্‌স্ বলেছিলেন—"আপনার ন্যায় বক্তৃত্ব শক্তি পেলে আমি এক দিনেই সমগ্র জগৎকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করতে পারি।"

এই কৃষ্ণানন্দকে বাঙ্গালী ভুলতে বসেছে। ইনি বিদেশে যান নি। তাই স্বামী বিবেকানন্দের মত আন্তর্জাতিক খ্যাতি তাঁর ছিল না। কিন্তু যেন ভুলে না যাই যে, উচ্চাঙ্গের বাগ্মিতার জন্য তিনিও এক খ্যাতিমান্ পুরুষ এবং সনাতন ধর্ম্মের পুনঃপ্রচারে তাঁর ভূমিকাও সামান্য নয়।

পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি

এ প্রসঙ্গে আর একজন শাস্ত্রজ্ঞ মহাত্মার নাম করা যায়, যাঁর পাণ্ডিত্য ও বাগ্মিতা ছিল অসাধারণ। তিনি পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি (১৮৫১-১৯২৮)। ফরিদপুর জেলার মুখডোবা গ্রামে জন্ম। তদীয় ভাষণ ও শাস্ত্রব্যাখ্যায় তৎকালে বহু বিপথগামী হিন্দু আবার স্বধর্ম্মচেতনায় প্রতিষ্ঠিত হয়। "বাঙালী চরিতাভিধান" গ্রন্থ থেকে জানা যায়—তিনি কাশিমবাজারের জমিদারের সভাপণ্ডিত ছিলেন। 'সহবাস-সম্মতি আইন' প্রণয়নের বিরুদ্ধে তিনি তীব্র আন্দোলন পরিচালনা করেন। রক্ষণশীল হিন্দু-সমাজের নেতৃত্ব দানে তাঁর অবদান স্মরণীয়। 'ধর্ম্মব্যাখ্যা', 'ভবৌষধ', 'দুর্গোৎসব পঞ্চক', 'সাধন প্রদীপ', 'চূড়ামণি দর্শন' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা পণ্ডিতজী সাতাত্তর বৎসর কাল জীবিত ছিলেন। একই জেলার সন্তান স্বামী

প্রণবানন্দের ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ তখন পরিণত অবস্থায় পদার্পণ করেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আবির্ভাব বিধাতার এক পরম আশীর্ব্বাদ। উভয়ের সময়কাল যথাক্রমে ১৮৩৬-১৮৮৬ এবং ১৮৬৩-১৯০২। স্বামী বিবেকানন্দ-সাহিত্য অতি বিশালায়তন। দেশে দেশে স্বামীজীর বক্তৃতামালাসহ জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, কর্ম্মযোগ, রাজযোগ প্রভৃতি গ্রন্থের সমাহারে এই বিপুল সৃষ্টিকর্ম্ম সামগ্রিক মানবকল্যাণে উৎসর্গীকৃত। ধর্ম্মচিন্তার সঙ্গে দেশপ্রেম, সার্ব্বিক বিপ্লব, দরিদ্র-অবহেলিত মানুষের মুক্তি চেয়েছিলেন এই বিশ্বখ্যাত হিন্দুসন্ন্যাসী। ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলনে ছিল স্বামীজীর বীর্যদৃপ্ত স্বাদেশিকতার দুর্জ্জয় অনুপ্রেরণা।

স্বামী বিবেকানন্দ বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক ছুঁয়ে ইহ জীবন থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। এই সময়ের ভিতরে তিনি এক যুগান্তকারী ভাবতরঙ্গের স্রষ্টা। সমকালীন সকল উদ্ভট মতবাদ নিরসনপূর্ব্বক আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষ এবং ভারতের বাহিরেও সনাতন হিন্দুধর্ম্মের বিজয় পতাকার সমুড্ডীন, তদীয় অশেষ কীর্ত্তি। ভারতের হিন্দু মুক্ত হয় হীনমন্যতা থেকে, জেগে উঠে নব আত্মপ্রত্যয়ের দৃপ্ত প্রসাদে, সৃষ্টি হয় ধর্ম্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের বলিষ্ঠ ভূমি। স্বধর্ম্ম ও স্বসংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করে আপামর হিন্দুজনতা, অবসান হয় সকল বিতর্কের। অদ্বৈত-বেদান্তের ব্যবহারিক উপযোগিতা তিনিই প্রথম তুলে ধরেন মানুষের সম্মুখে। অনুপ্রেরণা দেন জাতি-বর্ণ-ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকল মানুষের নিষ্কাম সেবাব্রতের, পরিবেশ সৃষ্টি হয় মানুষ গঠনের অনুকূল আদর্শ শিক্ষা বিস্তারের, গড়ে তুলেন বেলুড়ে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন। স্বামীজীর বেদান্তবাদে মূর্ত্তিপূজা নিন্দিত হয় নি, হয়েছে উচিত অভিনন্দিত, পরিত্যক্ত হয় নি বর্ণাশ্রম, হিন্দুর যুগ-যুগ পরম্পরাগত সদনুষ্ঠানগুলিও কোথাও খর্ব্বিত হয় নি এবং রামমোহনের ন্যায়

ভারতীয় নীতিবাদকে তিনি ছোট ক'রে দেখান নি। খৃষ্টধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের ক্ষীণ প্রতিধ্বনি মাত্র, একথা ঘোষণায় স্বামীজী দ্বিধাগ্রস্ত নহেন। ধর্ম্মের নামে সারা পৃথিবীতে চূড়ান্ত নিষ্ঠুরতা ও রক্তপাত করেছে ইসলাম, এই অপকীর্ত্তির নিন্দায় আড়ষ্ট হয় নি তাঁর বাগ্মী রসনা। দয়ানন্দের ন্যায় 'হিন্দু' নাম বর্জ্জনের কথা তিনি ভাবতেই পারেন না, বরং বলেছেন—"আমি নিজেকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে গর্ব্ব অনুভব করিয়া থাকি।...এখন ধর্ম্ম ও হিন্দু—এই দুইটি শব্দ একার্থবাচক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহাই আমাদের জাতির বিশেষত্ব, ইহাতে আঘাত করিবার উপায় নাই।...আমি এই হিন্দু শব্দটি কোন মন্দ অর্থে ব্যবহার করিতেছি না ; আর যাহারা মনে করে, ইহার কোন মন্দ অর্থ আছে তাহাদের সহিত আমার মতের মিল নাই।" তাঁর মতে —"হিন্দুধর্ম্মই পৃথিবীর অন্য সকল ধর্ম্মের জননী।" স্বদেশে ও বিদেশে তদীয় পরিচিতি ছিল Hindu Monk রূপে। চিকাগো ধর্ম্মসভায় স্বামীজীর যোগদান হিন্দুধর্ম্মের প্রতিনিধিরূপেই এবং হিন্দুধর্ম্মের সহনশীলতা, উদার মহিমা এবং বৈশিষ্ট্যের চিত্রটি তিনি তুলে ধরেন বিশ্ববাসীর সম্মুখে, জয় হয়েছিল সেখানেই। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আবির্ভাবে হিন্দুর চেতনায় হিন্দুত্বের অনুপ্রেরণাই উজ্জীবিত। ব্রাহ্মভক্ত ভগবান্ দাসকে স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন —"ঋষিদের ধর্ম্ম—সনাতন ধর্ম্ম, অনন্তকাল আছে ও থাকবে। এই সনাতন ধর্ম্মের ভিতর নিরাকার সাকার সব রকম পূজা আছে, জ্ঞানপথ, ভক্তিপথ সব আছে। অন্যান্য যে সব ধর্ম্ম, আধুনিক ধর্ম্ম, কিছুদিন থাকবে, আবার যাবে।" "যত মত, তত পথ"-এর প্রবক্তা হয়েও তিনি স্বধর্ম্মে পূর্ণ নিষ্ঠা রাখতে বলেছেন। উদাহরণ দিয়েছেন, ঘরের কুলবধূ আত্মীয়-পরিজনের সেবা করে, কিন্তু শয্যাসঙ্গিনী হয় শুধু স্বামীর। স্বামীর সঙ্গে তার একান্ত স্বতন্ত্র সম্বন্ধ, যা অন্যের সম্বন্ধে নেই। অন্যের অঙ্কশায়িনী হলে সে হয় ব্যভিচারিণী। অতএব, অন্য ধর্ম্মে শ্রদ্ধা রেখেও স্বধর্ম্মনিষ্ঠা থাকবে অক্ষুণ্ণ। স্বধর্ম্মে নিষ্ঠাত্যাগ ব্যভিচারতুল্য। পুনঃ স্বামী বিবেকানন্দজীর উক্তি—"Hinduism must be aggressive and the Hindus a little fanatic. বিধর্ম্মীর আগ্রাসন

থেকে স্বধর্ম্মরক্ষার প্রয়োজনেই বিবেকানন্দের এই স্পষ্টোক্তি। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে এই হিন্দুত্বের চেতনাকে অখণ্ড সাংগঠনিক রূপ দেওয়া হলো কই? কালে কালে হাওয়াটা গেল ঘুরে। আমাদের আহম্মুকি। Hindu Monk স্বামী বিবেকানন্দের সংস্পর্শ থেকে ক্রমে পশ্চাদপসরণ এবং হিন্দু নাম উচ্চারণে আড়ষ্টতা ও অনীহা। অথচ, বিংশ শতাব্দীর প্রায় শুরু থেকেই হিন্দুর সমস্যা অধিকতর জটিল ও ভয়াবহ। ধর্ম্মহীনতা ও নৈতিক অধোগতি বেড়েই চলেছিল, ইংরাজী শিক্ষিতদের ভিতরে পাশ্চাত্যায়ন মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল, খৃষ্টান মিশনারীরা দলে দলে ঝাঁকে ঝাঁকে হিন্দুকে ধর্ম্মান্তরিত করছিল। তারপর? আরো দুর্দ্দৈব। সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়বাদ এবং ধর্ম্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদের আপাতমধুর বুলিকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে দ্বিজাতিতত্ত্বের ঐস্লামিক রক্তাক্ত ঝাণ্ডা প্রচণ্ড সংহত শক্তি নিয়ে উড্ডীন হয় ভারতের মাটিতে। সেই দাপটে হিন্দুর ধন-মান-প্রাণ বিপন্ন, স্বার্থ ও অধিকার ক্ষুণ্ণ, নারীর ইজ্জৎ ভূলুণ্ঠিত, দেবস্থান চূর্ণিত বা কলুষিত, ভারত-খণ্ডন আসন্ন। সেই দুঃসময়ে প্রয়োজন হয়েছিল আর একজন মহাশক্তিধর যুগনায়কের নেতৃত্ব, যিনি মহামিলন ও মহাসমন্বয়ের প্রবক্তা হয়েও বাস্তব সমস্যাকে বাস্তব উপায়ে মোকাবিলার জন্য অন্ততঃ একটা প্রাণপাতী প্রচেষ্টা ক'রে যাবেন, গড়ে তুলবেন বর্ত্তমান ও ভবিষ্য কালের জন্য একটা সংগ্রামী প্রতিরোধ ও প্রতিবাদের দৃঢ় সংগঠন। তিনি কে? তিনি অবশ্যই হবেন এমন এক মহাব্যক্তিত্ব যাঁকে সস্তা লোকপ্রিয়তা অর্জ্জনের প্রলোভন পথভ্রান্ত করতে পারবে না। আমাদের ঘরেই তো আজ ভাঙ্গন। আছে উপাস্য ও উপাসনার প্রশ্নে মত ও পথের পার্থক্য, আছে দার্শনিক মতবাদেব নানা স্কুল, সর্ব্বোপরি আছে জাতপাতের তুমুল দ্বন্দ্ব। এর নিরসন চাই সর্ব্বাগ্রে। নচেৎ মহাসমন্বয় তো হয়ে দাঁড়ায় প্রলাপোক্তি। সুতরাং, প্রথম কর্ত্তব্য হওয়া উচিত ঘর সামলানো। অধুনা যখন সেই পুরাতন সাম্প্রদায়িক দুর্ব্বৃত্তপনা ভারতের ভিতরে ও বাইরে, বিচ্ছিন্নতাবাদ ও সন্ত্রাসবাদে জনজীবন বিপর্য্যস্ত, রাজনৈতিক কোন্দলে মুখ্যতঃ বিরাট হিন্দুসমাজই আবার

দলাদলি, বিভেদ ও খুনোখুনিতে প্রমত্ত, সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের বঞ্চিত করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের তোষণে ও পোষণে ভোটভিক্ষুকের পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরিলিপ্ত, পুনশ্চ জাত-পাতের সঙ্ঘাত রাক্ষুসী মূর্ত্তিতে প্রকটিত, দেশখণ্ডনের ষড়যন্ত্র প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, তখন মানুষ সেই বরেণ্য যুগনায়ককেই স্মরণ করুক—গ্রহণ করুক তদীয় প্রবর্ত্তিত ও উপদিষ্ট সংগঠন ও আমূল সংস্কারের অভ্রান্ত কর্ম্মপন্থা। তিনি আলোচ্য উনবিংশ শতাব্দীরই সর্ব্বশেষ দেবশিশু, আর বিংশ শতাব্দীতে তিনি পূর্ণ ভাগবত পুরুষ। সুদীর্ঘ আটশত বৎসরের সমাজ বিবর্ত্তনের গুরুভার ঋণ পরিশোধের প্রতিশ্রুতি নিয়েই তদীয় মহাবির্ভাব।

নবম অধ্যায়

বিংশ শতাব্দীর হিন্দু-সমাজ

এই শতাব্দীর সামাজিক খণ্ড আন্দোলন

বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে যখন রাজনীতি ক্ষেত্রে কংগ্রেসের স্বাধীনতা আন্দোলন তুঙ্গে এবং স্বামী প্রণবানন্দ তদীয় যোগৈশ্বর্য্যের পাবনী শক্তিপ্রভাবে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও জাতিগঠনের কর্ম্মযজ্ঞে অবতীর্ণ, ঠিক সেই সময় পাশাপাশি আরো কতক সংস্কার আন্দোলন আসরে অবতীর্ণ। ঐ সকল আন্দোলনের প্রকৃতি মূলতঃ প্রতিক্রিয়াধর্ম্মী। রঘুনন্দন ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর তিন বর্ণকেই চিহ্নিত করেছিলেন দাসরূপে। ব্রাহ্মণের সহিত শূদ্র বা দাসের বিরাট ব্যবধানের স্রষ্টাও তিনি। এই বিধানের বিরুদ্ধে বিপ্লবের ডাক দেন উক্ত বিশিষ্ট আন্দোলকেরা। জাগিয়ে তুলতে চান অবহেলিত, অপমানিত শূদ্রশক্তির ভিতরে দুর্জ্জয় আত্মসম্ভ্রম ও আত্মচেতনা। কেন তারা আখ্যাত হবে 'দাস' নামে? কেন তারা 'ওঁ' স্থানে উচ্চারণ

করবে নমঃ? কেনই বা হবে তারা জল-অচল, অচ্ছুঁৎ? অবিচার! ঘোরতর অবিচার! না, শূদ্র আর ঘুমিয়ে থাকবে না। তার মূর্চ্ছাভঙ্গ হয়েছে। সে এখন বুঝে নিবে তার ন্যায্য অধিকার।

বৈদিক বর্ণাশ্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রের গুণকর্ম্মাধিকারগত যথাযোগ্য স্থান নির্দ্দেশ। এ প্রসঙ্গে "হিন্দুসমাজ বিজ্ঞান" প্রণেতা অধ্যাপক কালীপ্রসন্ন দাসের উক্তি প্রণিধানযোগ্য। যথা—"ব্রাহ্মণ্য অর্থাৎ উন্নত বুদ্ধি, বিদ্যা ও জ্ঞানের শক্তি (force of superior intellect, learning and wisdom), ক্ষাত্র অর্থাৎ শৌর্য্যবীর্য্যের শক্তি (force of martial and rulling spirit), বৈশ্য অর্থাৎ ধনোৎপাদক ব্যবসায়িক শক্তি (force of wealth producing industrial capacity) এবং শৌদ্র অর্থাৎ দৈহিক শ্রমশক্তি (force of mannual labour of non-intellectual masses)। এই চারিটি শক্তির অনুরূপকর্ম্মের অধিকারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এইরূপ চারিটি যে প্রধান শ্রেণী বা স্তর সাধারণতঃ মানব-সমাজে গড়িয়া উঠে, যথাক্রমে তাহারা সমাজের চালক ও শিক্ষক, শাসক ও রক্ষক, পোষক ও পালক এবং সেবক ও ধারক হইয়া দাঁড়ায়। ইহা ব্যবসায়িক division of labour এর ন্যায় কৃত্রিম একটা কার্য্যপ্রণালীর নির্দ্ধারণ নহে —natural division of organic social functoins, নৈসর্গিক ধর্ম্মে অভিব্যক্ত সামাজিক কর্ম্মবিভাগ। বিভাগ বটে, কিন্তু সকলের কর্ম্মই সকলের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে সংসৃষ্ট।" (পৃঃ ৬৩১) অর্থাৎ, নিজ নিজ যোগ্যতার দ্বারা তাঁরা একই মহাজাতির বর্ণোচিত পরিসেবারত। ছোঁয়াছোঁয়ির বিতর্ক কেন? হিন্দুজাতিকে ভেদক্ষীণ্ন করেছে এই অস্পৃশ্যতা ও অনাচরণীয়তা। এই পাতকের বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রাম করেছেন ব্রাহ্মসমাজ ও আর্য্যসমাজের পুরোধা পুরুষগণ। স্বামী বিবেকানন্দের কণ্ঠেও তীব্র ভর্ৎসনা—"জ্ঞানমার্গ, কর্ম্মমার্গ, ভক্তিমার্গ সব পলায়ন, এখন আছে মাত্র ছুঁৎমার্গ—আমায় ছুঁয়োনা, আমায় ছুঁয়োনা। পৃথিবীর সবাই অপবিত্র, কেবল আমিই পবিত্র। হিন্দুর ব্রহ্ম এখন ব্রহ্মলোকে নাই, গোলোকেও নাই, মুনি-ঋষির হৃদয়কন্দরেও নাই, উপাসনা-তপস্যাতেও নাই—ব্রহ্ম এখন রান্নাঘরে,

যক্ষ্ম এখন ভাতের হাঁড়িতে।" এ পাপ অপনয়নের বাস্তব উপায় কি, স্বামীজী তা নির্দ্দেশ করেন নি। কিন্তু সমাজ-কল্যাণকামী তেজস্বী সন্ন্যাসী যে বাচিক আণবিক অস্ত্রটি ফাটিয়েছিলেন, তার শক্তির ওজন ছিল প্রচণ্ড এবং তা মানুষের অন্তরকে নাড়া দিয়েছিল। পরবর্ত্তীকালে কবি রবীন্দ্রনাথ ও কবি কাজি নজরুল ইসলামের প্রসিদ্ধ কবিতায় স্বামীজীর উক্ত বাণীরই যেন প্রতিধ্বনি।

জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত-জালিয়াৎ খেল্‌ছো জুয়া,
ছুঁলেই তোর জাত যাবে? জাত ছেলের হাতের নয়কো মোয়া।
হুঁকোর জল আর ভাতের হাঁড়ি, ভাবিস্ এতেই বুঝি জাতির জান,
তাই তো বেকুব করলি তোরা এক জাতিকে একশ খান
এখন দেখি ভারত-জোড়া
প'চে আছিস বাসী মড়া,
মানুষ নেই, আজ আছে শুধু জাত-শেয়ালের হুক্কা-হুয়া।

কবীন্দ্র রবীন্দ্র নাথের "হে মোর দুর্ভাগা দেশ।" কবিতার আবেদনও বড় মর্ম্মস্পর্শী। মানুষকে তার প্রাপ্য অধিকারে বঞ্চিত করে যাকে কোল দাও নি, যাদের অপমান করেছ, অপমানে তোমাকেও তাদের সমান হতে হবে। মানুষকে অস্পৃশ্য করা মানেই মানুষের প্রাণের ঠাকুরকে অপমান করা। তোমার আসন থেকে এই অবহেলিতদের দূরে ঠেলে দিয়ে কি কাজ করলে? তোমার শান্তিকেই তো হেলায় নির্ব্বাসন দিলে। কবির নিজের ভাষায়—

যারে তুমি নীচে ফেল সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে,
পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।
অজ্ঞানের অন্ধকারে আড়ালে ঢাকিছ যারে
তোমার মঙ্গল ঢাকি গড়িছে সে ঘোর ব্যবধান।
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।।

কবির শেষ উক্তি যেন দৈববাণীর মতই সত্য। এই যে ভেদাভেদ তা তো জাতীয় মহামৃত্যুই কারণ।

দেখিতে পাওনা তুমি মৃত্যুদূত দাঁড়ায়েছে দ্বারে,
অভিশাপ আঁকি দিল তোমার জাতির অহঙ্কারে?

সবারে না যদি ডাক এখনো সরিয়া থাক
আপনারে বেঁধে রাখো চৌদিকে জড়ায়ে অভিমান,
মৃত্যুমাঝে হবে তবে চিতাভস্মে সবার সমান।

প্রাসঙ্গিকতায় ফিরে আসি। খৃষ্টীয় বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে এমন কয়েক জন সংস্কারকের আত্মপ্রকাশ, যাঁদের অনেকেরই কোন প্রাতিষ্ঠানিক পরিচয় নেই। এঁদের ভিতর পণ্ডিত দিগীন্দ্র নারায়ণ বিদ্যাভূষণের নাম সর্ব্বাগ্রে স্মরণে আসছে। বাংলা ১৩৩১-৪৬ সালের ভিতরে তিনি ছোট-বড় অসংখ্য গ্রন্থের প্রণেতা। যথা—'জাতিভেদ' 'জলচল ও স্পর্শদোষ বিচার' 'কোরবানি ও আত্মবলি' 'বিদেশী বর্জ্জন' 'মালী জাতির উদ্বোধন' 'বৈশ্যতত্ত্ব বা তেলী জাতির ইতিবৃত্ত'* 'সাধনায় সিদ্ধি' 'স্বরাজ সাধনায় নরসুন্দর সমাজ' 'নাপিতের ধৃষ্টতা' 'পৌন্ড্রক্ষত্রিয় সমাজে নব জাগরণ' 'নাগর ক্ষত্রিয় জাগরণ' 'বৈশ্য তন্তুবায় জাতির নব জাগরণ' 'নিপীড়িত শূদ্রের নিদ্রাভঙ্গ' 'বড় হাড়ী সমাজের উদ্বোধন' 'মাহিষ্য ক্ষত্রিয় জাগরণ' 'নারী জাগরণ' প্রভৃতি। এই সকল গ্রন্থের সহিত বর্ত্তমান নিবন্ধ লেখকের অধ্যয়নগত পরিচয় আছে। সন্দেহ নেই, এই সমস্ত গ্রন্থে পণ্ডিতজীর যথেষ্ট শাস্ত্রজ্ঞান, যুক্তি, সমাজপ্রীতি ও স্বদেশপ্রীতির পরিচয় বর্ত্তমান। তিনি নিজে ব্রাহ্মণ সন্তান হয়েও চেয়েছেন শূদ্রের মুক্তি।

অতঃপর পণ্ডিত দীনবন্ধু বেদশাস্ত্রীর নাম উল্লেখ্য। ইনি ছিলেন আর্য্য সমাজের বঙ্গীয় শাখার একজন শক্তিশালী প্রচারক। বেদশাস্ত্রীজীর রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে সাতখানি উল্লেখযোগ্য। যথা 'বেদসার' 'শ্রাদ্ধ' 'সমাজ বিপ্লব' 'ব্রাহ্মণ শূদ্রের সঙ্ঘর্ষ' 'ভাটপাড়া

---

* উল্লেখ্য যে, গোপ, মালী, তৈলী, তন্ত্রী, মোদক, বারুজীবী, কুম্ভকার, কর্ম্মকার, নাপিত এই কয়টিকে পরাশর নবশায়ক বা নবশাকের অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং বঙ্গে এই নবশাকেরা অদ্যাপি বিদ্যমান। তাদের ভিতরে জলচল আছে, কিন্তু বৈবাহিক সম্পর্ক হয় না।

গোপো মালী তথা তৈলী তন্ত্রী মোদকবারুজী।
কুলালঃ কর্ম্মকারশ্চ নাপিতো নবশায়কাঃ। —পরাশর সংহিতা

বধ কাব্য' 'শুদ্ধি' এবং 'বিধবা বিবাহের আপত্তি খণ্ডন।' এই সাতখানির ভিতরে কিছু বই বর্ত্তমান লেখকের পড়া। বঙ্গীয় হিন্দু মহাসভার সহকারী সম্পাদক নরেন্দ্র নারায়ণ চক্রবর্তীর 'বিধবা বিবাহ' এবং 'বিদ্রোহী শূদ্র', কেদারনাথ শীলশর্ম্মা-প্রণীত 'নাপিত তত্ত্ব' 'স্বরাজ সাধনায় নরসুন্দর সমাজ' 'নাপিত বিজয়' প্রভৃতি গ্রন্থের বিষয়ও জানা আছে। এ ছাড়া কর্ম্মার ক্ষত্রিয়দের জাগরণ বিষয়েও একখানি গ্রন্থ কলেজ ছাত্রজীবনে পড়েছিলাম।

এই সকল গ্রন্থের প্রকৃতি কি? দিগীন্দ্রবাবুর গ্রন্থাবলীর বিজ্ঞাপনে চোখ বুলালেই তা পরিষ্কার হয়ে যায়। উক্ত বিজ্ঞাপনে লেখা হয়েছে —"যুগান্তকারী গ্রন্থাবলী, নিপীড়িত শূদ্রের নূতন বেদ। জ্বলন্ত ও জীবন্ত ভাষায় হৃদয়ের তপ্ত শোণিতে লিখিত। প্রচারে সমাজ মধ্যে নবযুগের সঞ্চার হইয়াছে। পদদলিত মৃতবৎ প্রাণে জীবন সঞ্চারিণী সঞ্জীবনী সুধার স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে। আভিজাত্যের দুর্গ ভূমিস্মাৎ ও বৃথা জাত্যাভিমান চূর্ণ-বিচূর্ণ. করা হইয়াছে। সামাজিক অধিকারপ্রার্থী প্রত্যেক জাতি ও ব্যক্তির অবশ্য পাঠ্য।"

পূর্ব্বেই উক্ত হয়েছে, এই সকল পুস্তকে লেখকদের পাণ্ডিত্য ও যুক্তি পর্য্যাপ্ত। বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, মহাকাব্যাদি শাস্ত্রমন্থনপূর্ব্বক তাঁরা প্রতিপন্ন করেছেন মধ্যযুগের ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম শূদ্রদের প্রতি ঘোর অবিচারী। এজন্য দোষী ব্রাহ্মণদের ভদ্র ভাষায় যতদূর তিরস্কার করা যায় তার কোন ত্রুটি রাখা হয় নি। তিরস্কৃত হয়েছেন বর্ণ হিন্দুরাও। দীনবন্ধু বেদশাস্ত্রীজী তো বে-সামাল। দেবপূজাকে তিনি বলেন বামুনদের পেটপূজা। অবশ্য দিগীন্দ্রবাবুর রচনায় এরূপ কটূক্তি নেই। বরং কঠোর সমালোচনাকারী হয়েও অনেক ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণাদির নিকট আবেদনে তিনি সবিনয়ী। পুনঃ উল্লেখ্য যে, বেদ শাস্ত্রীজীর সঙ্গে বর্ত্তমান লেখকের ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল। বিভিন্ন সভামঞ্চে অনেকবার পাশাপাশি বসেছি। সেখানে কিন্তু শাস্ত্রীজী বড় ভাল মানুষ। কোন বিদ্রোহ নেই।

তথাপি পুনরুক্তি করেই বলা যায়, সামগ্রিক বিচারে এই খণ্ড আন্দোলন সমূহ মূলতঃ প্রতিক্রিয়াধর্ম্মী। সঙ্ঘাচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দ

এই জাতীয় প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলনের বিরোধী। তিনি চান নি জাত-পাত নিয়ে বিরোধ ও সঙ্ঘাত। তিনি চেয়েছেন—মহামিলন ও মহাসমন্বয়। উন্নত মানুষদের নীচে নামিয়ে অনুন্নতেরা যদি তাদের সমান হতে চায়, তবে তার চেয়ে নির্ব্বুদ্ধিতা আর কি হতে পারে? অনুন্নতেরা আপন কর্ম্মে উপরে উঠে উন্নতদের সমান হোক, তাতেই গৌরব, তাতেই কল্যাণ ও সমৃদ্ধি। কিন্তু উন্নতদের প্রতি হিংসা ও ঈর্ষ্যাপরায়ণ অনুন্নতেরা তা না বুঝে অনেক ক্ষেত্রে সমাজে প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলনের সামিল হয়ে বিংশ শতাব্দীর আমূল সংস্কার প্রচেষ্টায় অন্তরায় সৃষ্টিকারী।

স্বামী প্রণবানন্দের বজ্রগর্জ্জন

একটি দৃষ্টান্ত মনে পড়ে। ইং ১৯৪০ সাল। এই লেখক একদা সঙ্ঘের সমাজ-সংগঠন কার্য্যে ভিক্ষা সংগ্রহের প্রয়োজনে কলকাতা ইণ্টালি পল্লীতে তৎকালিন এক খ্যাতিমান পৌন্ড্রক্ষত্রিয় নেতার দ্বারে উপস্থিত। ভিক্ষা পাওয়া গেল না, বিনিময়ে লাভ হলো কিছু বাক্যবাণ। মনের ঝাল মিটিয়ে উপসংহারে তিনি বলেন—"আমাদের অধিকার আমরা বুঝে নিব।" লেখকের নিকট এই উক্তি শুনে সঙ্ঘাচার্য্য উত্তেজিত কণ্ঠে বলেন—"আরে মূর্খ! কে তোর অধিকার নিয়ে বসে আছে? কে তোর অধিকার কেড়ে নিয়েছে? তোর অধিকার তোর নিজের কাছে।" অর্থাৎ, পরস্পর দোষারোপ ও বিদ্বেষ—অধিকার লাভের প্রকৃষ্ট পথ নয়। নিজে যোগ্যতা অর্জ্জন কর, অধিকার আপনি আসবে। অধুনা নমঃশূদ্র, পৌন্ড্রক্ষত্রিয়, সাহা প্রভৃতি সম্প্রদায়ের ভিতরে কত জ্ঞানী, গুণী, কৃতী মানুষের অভ্যুত্থান। তা কি কোন ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের অনুগ্রহে? তাঁরা বড় হয়েছেন নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে, আত্মশক্তির প্রভাবে। সুতরাং, অধিকারের প্রশ্নে বিভেদ কেন?

হরিজনদের মন্দির প্রবেশ আন্দোলন

হরিজনদের নিয়ে বলপূর্ব্বক মন্দির প্রবেশের আন্দোলনের

উদ্ভবও এই সময়ের। এই আন্দোলনও ভ্রান্ত। এতে হরিজনদের কি লাভ হয়েছে? এতে উচ্চ-নীচের সঙ্ঘাত ও বিদ্বেষে কেবল যুক্ত হয়েছে নূতন মাত্রা। এই আন্দোলনের প্রকৃতি ছিল রাজনৈতিক কায়দার। কিন্তু মন্দির কোন রাজনৈতিক বা সামাজিক কোন্দলের স্থান নয়। মন্দির দেবতার অধিষ্ঠান ক্ষেত্র। অতএব, এই জাতীয় আন্দোলনও স্বামী প্রণবানন্দের অনভিপ্রেত। তিনি বলেন—"যখন ভক্তি-অভক্তি, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, শ্রদ্ধা-অশ্রদ্ধা বলিয়া একটা কিছু আছে, তখন জোর করিয়া মন্দির প্রবেশ করাইলেই সকল নীচু জাতি বড় হইয়া গেল না। ইহা তো ব্যভিচার, ইহা তো অত্যাচার।" এ সকল ঠুনকো আন্দোলনে ক্ষণিক চমক থাকতে পারে, কিন্তু সার কিছুই নেই। কতক বিশেষ পুরাণো জীর্ণ মন্দিরে প্রবেশের অধিকার নিয়ে আত্মকলহ কেন? গ্রামে গ্রামে সহরে সহরে সর্ব্বত্র সর্ব্বশ্রেণীর হিন্দুর সাধারণ মিলন ক্ষেত্র রচনা কর—তার নামকরণ হোক হিন্দু মিলন মন্দির। যুগাবতার প্রণবানন্দ সেই মহৎ কার্য্যটিই করেছেন। যথাস্থানে তা আলোচ্য।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের আন্দোলন ছিল মুখ্যতঃ রাজনৈতিক। ইংরাজের অবাধ শাসন-শোষণ থেকে মুক্ত ক'রে দেশের স্বাধীনতা অর্জ্জনই ছিল এই আন্দোলনের চূড়ান্ত লক্ষ্য। বোধহয় তাই হিন্দুসংগঠন আন্দোলনকে কংগ্রেসীরা ভাল চোখে দেখেন নি। তাঁদের ধারণা—এতে হিন্দু-মুসলিমকে ঐক্যসূত্রে বেঁধে তাঁরা যে স্বাধীনতা আন্দোলনে ব্রতী তা ব্যাহত হবে। আমরা পরে দেখবো হিন্দুত্বের প্রতি এই অনীহার কি ভয়ঙ্কর মূল্য দিতে হয়েছে।

তখন ভারতে মুসলমানের সংখ্যা কিছু কম ৯ কোটি, তপশীলীরা বর্ণহিন্দুদের এক তৃতীয়াংশ। এই বিপুল জনগোষ্ঠীকে বাদ দিয়ে স্বরাজ লাভ কি সম্ভব? মহাত্মা গান্ধীজী চেয়েছেন এই উভয় গোষ্ঠীকেই সন্তুষ্ট ক'রে এক পতাকার তলে আনয়ন করতে। এ জন্যই গান্ধীজীর হরিজন আন্দোলন। সন্দেহ নেই, দরদী প্রাণ

নিয়েই তিনি ডোম, মেথর, ঝাড়ুদার ব'লে যারা সমাজে অন্ত্যজ, তাঁদের সঙ্গে বসবাস করেছেন, তা'দিগকে ভালবেসেছেন, আদর করেছেন, কিন্তু মুসলিমদের মন গলাতে তাঁকে বেঁছে নিতে হয় মাত্রাতিরিক্ত তোষণের পথ। দাবীর পর দাবী মেনে নিয়েও ভবী নহে ভুলিবার'। অবশেষে তিনি মুসলিম লীগের নেতা মহম্মদ আলি জিন্নাকে দিতে চাইলেন ব্লাঙ্ক চেক, অর্থাৎ নিঃশর্ত্তনামা। তাতেও কিন্তু এই ৯ কোটি মানুষকে এক জাতীয়তার আন্দোলনের সামিল করা গেল না, রোধ করা গেল না দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দেশ খণ্ডন। আর অচ্ছুঁৎদের গায়ে আপাত মনোরম হরিজনের নামাবলী পরিয়ে দিলেও তারা যেখানে ছিল, সেখানেই থেকে গেল। হরিজন মানেও অচ্ছুঁৎ। কংগ্রেসী নেতাদের বিশ্বাস ছিল একবার স্বরাজটা হাতের মুঠোয় এলে হয়, তখন আইন করে জাত-পাতের বালাই এক দিনেই মুছে ফেলা যাবে। পরে আমরা দেখবো, স্বাধীনতার পর সামাজিক অযোগ্যতা দূরীকরণ আইন প্রবর্ত্তিত হওয়া সত্ত্বেও অস্পৃশ্যতা এ অনাচরণীয়তার আপদ দূর হয় নি। বরং অধুনা জাত-পাতের দ্বন্দ্ব আরো কুৎসিত মূর্ত্তিতে প্রকটিত। তপশীলী হিন্দু ও তপশীলী উপজাতীয়দের পরেও মণ্ডল কমিশনের সুপারিশের সুবাদে আরো কত সংখ্যক OBC বা Other backward class ভূমিষ্ঠ হয়েছে তা একবার সতর্কতার সঙ্গে গুণতি ক'রে দেখুন, আর পরস্পর চলছে সুবিধা ভোগের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এই ব্যবস্থার ভাল দিক কিছু থাকতে পারে, বঞ্চিতেরা পাবে সরকারী সাহচর্য্য। কিন্তু ধান্দাবাজ, স্বার্থপর, ক্ষমতালোভী রাজনৈতিক নেতাদের উস্কানিতে সমাজক্ষেত্রে ঘটছে এক নূতন ধাঁচের উত্তপ্ত প্রতিক্রিয়া—টুক্‌রো টুক্‌রো হতে চলেছে হিন্দুর সংহতিবন্ধন।

হিন্দু মহাসভা

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস যখন অতিরিক্ত মুসলিম তোষণে ব্যাপৃত, আর এই তোষণ ও পোষণ নীতিকে অগ্রাহ্য পূর্ব্বক মুসলিম লীগ সম্পূর্ণ হিংসার পথে লড়াই ক'রে পৃথক্ পাকিস্থান রাষ্ট্র স্থাপনে

ঐক্যবদ্ধ, মুসলিমপ্রধান পাঞ্জাব, সিন্ধু, সীমান্ত প্রদেশ, বঙ্গ ও আসামে লীগের সাম্প্রদায়িক দৌরাত্ম্যে হিন্দুর ধন, মান, প্রাণ, স্বার্থ ও অধিকার বিপন্ন, দুর্য্যোগের সেই অশুভ ক্ষণে ভারতে হিন্দু মহাসভার অভ্যুত্থান ইতিহাসের এক স্মরণীয় তাৎপর্য্যপূর্ণ ঘটনা। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে বিপ্লবী বীর বিনায়ক দামোদর সাভারকার এবং ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলার সিংহ সন্তান ডঃ শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় হিন্দু মহাসভায় যোগদান করেন। ফলে মহাসভার প্রভূত বলসঞ্চয় হয়। ব্যারিষ্টার বি, সি, চ্যাটার্জ্জী, ব্যারিষ্টার নির্ম্মল চন্দ্র চ্যাটার্জ্জী, স্যার মন্মথ নাথ মুখার্জ্জী, ডঃ মুঞ্জে, ভাই পরমানন্দ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ হিন্দুনেতাদের ভূমিকাও ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এঁরা সকলেই রাজনৈতিক ভাবে মুসলিম লীগের রক্তাক্ত দুর্ব্বৃত্তপনা ও অযৌক্তিক দেশ খণ্ডনের দুরভিসন্ধিকে মোকাবিলার জন্য নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামী। সারা ভারতে কংগ্রেসের মিশ্র জাতীয়তাবাদের পাশাপাশি বিশুদ্ধ হিন্দু জাতীয়তার এক প্রবল তরঙ্গ উঠেছিল। হিন্দুদের সম্মুখে তখন এক সাধারণ দুর্ব্বিপত্তি। মুসলিম পীড়নের বলি তখন শুধু বর্ণহিন্দুই নয়—তপশীলীরাও। মহাসভা চেয়েছেন এই যে সাধারণ বিপত্তি বা Common danger—তা থেকে মুক্তি পেতে অতীতের সকল বিভেদ ভুলে সর্ব্বশ্রেণীর হিন্দু ঐক্যবদ্ধ হোক। মহাসভা শিখদিগকেও এক পতাকার তলে আহ্বান করেন। অস্পৃশ্যতা ও অনাচরণীয়তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন হিন্দু মহাসভাও। কিন্তু আমরা জানি—মহাসভার আন্দোলনও মুখ্যতঃ রাজনীতির আশ্রয়ী। মূল থেকে সমাজ সংগঠনের কোন অরাজনৈতিক কর্ম্মপরিকল্পনা তাঁদেরও ছিল না। এই অভাগা দেশে সেই কাজটি করেন আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দ। তৎপ্রবর্ত্তিত হিন্দু মিলন মন্দির ও রক্ষিদল আন্দোলন তখন চলছে পূর্ণোদ্যমে। তাৎকালিক রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের ভয়াবহতা ও হিন্দুদের আসন্ন বিপর্য্যয় আচার্য্যকে এতই উদ্বিগ্ন ক'রে তোলে যে, ধর্ম্মগুরু হয়েও তিনি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিন্দু মহাসভার সহিত সংযোগ রক্ষা ক'রে চলতে দ্বিধাবোধ করেন নি। তিনি মহাসভার রাজনৈতিক আন্দোলন এবং ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সংগঠন আন্দোলনকে

পরস্পর অনুপূরকরূপে গ্রহণ করেন। বলেন—"হিন্দু মহাসভা রাজনৈতিক ভাবে সংগ্রাম করুক, আর আমরা করি গ্রামগুলি সংগঠন।" তিনি বি, সি, চ্যাটার্জী, মন্মথ নাথ মুখোপাধ্যায়, ডঃ শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে প্রায়শঃ ডেকে আনতেন নিজের কাছে, উৎসাহ দিতেন, অনুপ্রেরণা সঞ্চার করতেন। কিন্তু ত্রিকালজ্ঞ মহাপুরুষ জানতেন তাঁর আয়ুষ্কাল স্বল্প। ভগ্ন শরীর আর পুরো দুটি বৎসরের অধিক টিকবে না। তাই ডঃ শ্যামাপ্রসাদের কণ্ঠে আপন কণ্ঠস্থিত মালা পরিয়ে দিয়ে তাঁকে করেন আশীর্ব্বাদ ও শক্তিসঞ্চার। স্বীয় বিশ্রামকক্ষে এসে প্রসন্ন হাস্যে বলেন—"বিপন্ন হিন্দুর সম্মুখে দাঁড়াতে পারে, সেই নেতা ঠিক ক'রে দিয়ে গেলাম।"

আচার্য্যের আশীর্ব্বাদ ব্যর্থ হয় নি। অধুনা যে অর্দ্ধবঙ্গে আমরা হিন্দুত্বের মর্য্যাদা নিয়ে বসবাস করছি, তা ডঃ শ্যামাপ্রসাদের দান —এ কথা কি অত্যুক্তি? ইংরাজের চালে মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের দাপটে যখন গোটা বঙ্গ, আসাম, পাঞ্জাব যায় যায়, জাতীয় কংগ্রেস ভারত বিভাগ মেনেই নিয়েছে, কম্যুনিষ্টরা বলেছে হিন্দু ও মুসলমান যখন দু'টো জাতি, তখন মুসলমানদের জন্য পৃথক্ রাষ্ট্র হওয়া উচিত, তখন শ্যামাপ্রসাদই প্রথম ব্যক্তি যিনি এই সর্ব্বনাশ থেকে অর্দ্ধরক্ষার আন্দোলনে ঝাঁপ দেন। আর পাঞ্জাবের অকালি নেতা মাষ্টার তারা সিং দাবী তোলেন হিন্দু ও শিখপ্রধান অঞ্চলকে ভারতভুক্ত করার। উভয়ের আন্দোলনই সকল। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের সীমা আরো বাড়তে পারতো। কারণ, তাৎকালিক সেন্সাস রিপোর্ট অনুসারে খুলনা, যশোহর, ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ ও মাদারীপুর মহকুমা এবং বরিশালের গৌরনদী পর্য্যন্ত এলাকা তপশীলীদের সহ হিন্দুপ্রধান। কিন্তু মুসলিম লীগের ধাপ্পায় ভুলে তপশীলী ফেডারেশনের আহম্মক নেতা যোগেন মণ্ডল, দ্বারিকানাথ বারুরী, রসরাজ মণ্ডল, ললিত মোহন বল, কুবের বিশ্বাস, কামিনী মজুমদার, মনোহর ঢালি, মুকুন্দ বিহারী সরকার, বৃন্দাবন বিশ্বাস, চৈতন্য বিশ্বাস প্রভৃতিরা র‍্যাটাক্লিফ রোয়েদাদ মিশনকে জানিয়ে দেন তাঁরা পাকিস্থানেই থাকতে চান। বর্ণহিন্দুদের কাছে নাকি

তপশীলীদের সুবিচার প্রাপ্তির কোন আশা নেই, দলিতদের স্বার্থ রক্ষা করবে মুসলিমরা। যোগেন বাবুদের মোহভঙ্গ হতে অধিক সময় লাগে নি। দেশ বিভাগের পরও পূর্ব্ব পাকিস্থানে হিন্দুনিগ্রহ চলেছে। ১৯৫০ সালে এর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারে মুসলিম বিরোধী দাঙ্গা। যোগেনবাবু তখন পাকিস্থানের আইনমন্ত্রী। তিনি খবর পান বরিশাল ও ফরিদপুরের গোপালগঞ্জ এলাকায় তাঁর নিজ নমঃশূদ্র সম্প্রদায়েরই কয়েক হাজার লোক খুন। কয়েক লক্ষ শরণার্থী পশ্চিমবঙ্গে পাড়ি দিয়েছে। যোগেন বাবু করাচি থেকে দ্রুত ফিরে এসে দেখেন এই মর্ম্মান্তিক শ্মশান দৃশ্য। তাঁর বুক জুড়ে তখন শুধু কান্না, আর কান্না। এই কান্না তিনি প্রকাশ করেন ঢাকার পি.টি. আইয়ের এক বিশেষ প্রতিনিধির সহিত সাক্ষাৎকারে। বলেন —"আমার কথায় বিশ্বাস করেই আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা পাকিস্থান সমর্থন করেছিল, কিন্তু আজ আমি কোথায়?" পি.টি. আইয়ের এই খবর ভারতের সংবাদ পত্রগুলিতে বড় বড় অক্ষরে প্রকাশিত হয়। ফলে পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খানের গোঁসা হওয়ারই কথা। তিনি যোগেন বাবুর কাছে কৈফিয়ৎ তলব করেন এবং করাচিতে ডেকে পাঠান। যোগেন বাবু বুঝতে পারেন অবস্থা বেগতিক। তিনি করাচি যাত্রার পথে কলিকাতা বিমানবন্দরে নেমে পড়েন—যান ও মান বাঁচাবার জন্য, শরণাগত হন ডঃ শ্যামাপ্রসাদের। কলিকাতা থেকেই মন্ত্রিত্বে ইস্তফা পত্র দিয়ে তিনি আজীবন থেকে যান ভারত ইউনিয়নে, এত সাধের পাকিস্থানে আর তিনি ফিরে যান নি। আমরা জানি, বর্ণ-হিন্দুদের ন্যায় লক্ষ লক্ষ তপশীলীরাও আশ্রয় নেয় ভারতে, বহু সংখ্যায় তারাও হয় উৎপীড়িত, বে-ইজ্জৎ, নিহত ও সর্ব্বস্বান্ত। বর্ণহিন্দুদের প্রতি বিদ্বেষের পরিণাম যে কত ভয়ঙ্কর, বিভ্রান্ত তপশীলী নেতারা তা বুঝলে এই অঘটন ঘটতো না। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড কার্জ্জন বঙ্গভঙ্গের ষড়যন্ত্র করেছিলেন, সেই ভাঙ্গার কাজটা সফল হলো ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে রক্তস্নানের ভিতর দিয়ে। তবু বাঙ্গালী হিন্দু যেটুকু পেল তা শ্যামাপ্রসাদেরই কল্যাণে। অমর হয়ে থাকুন শ্যামাপ্রসাদ

এবং তাঁর উপর যুগপুরুষের আশীর্ব্বাদ।

মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ও হিন্দুর বিপর্য্যয়

অবশেষে ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগ সম্পূর্ণ। তার পূর্ব্বে ১৯৪৬ সালে কলিকাতা ও নোয়াখালির দাঙ্গায় বহু হিন্দুর রক্তপাত, বহু নারীর সম্ভ্রম নষ্ট, বহু হিন্দুর সম্পত্তি লুঠ ও বহু হিন্দুর ধর্ম্মান্তরে বাংলায় ঘটে এক নারকীয় বীভৎসতা।

স্বামী প্রণবানন্দ যা আশঙ্কা করেছিলেন অবশেষে তা-ই হলো সত্য। বিখ্যাত ঐতিহাসিক ডাঃ নিমাই সাধন বসুর ভাষায়—"ভূকম্পের পূর্ব্বেই যাঁরা কম্পন অনুভব করেছিলেন, স্বামী প্রণবানন্দ তাঁদের অন্যতম।" তিনি স্বামী প্রণবানন্দের এক বার্ষিক জয়ন্তী সম্মেলনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন—"১৯০৬ খৃষ্টাব্দে স্বামীজীর বয়স যখন দশ বৎসর তখনই জন্ম নেয় মুসলিম লীগ। এর তিন চার বছর পরে মলিমিণ্টো শাসন সংস্কার এবং ভারতবর্ষের ইতিহাসে বিভেদ নীতির প্রথম বীজ বপন। এদেশে বিশেষ সম্প্রদায়কে বিশেষ সুবিধা দেওয়ার প্রস্তাব করা হচ্ছে। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের প্যাক্ট অচিরেই ভেঙ্গে যায়, আবার ভারতে নূতন ক'রে শুরু হয় ব্যাপক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। অতঃপর ব্যামলে ম্যাক্-ডোনাল্ডের বিখ্যাত সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা। তিরিশের দশকেই রহমত আলির প্রথম পাকিস্থান প্রস্তাব। সেই প্রস্তাব আস্তে আস্তে বিষবৃক্ষে পরিণত হয়। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে লাহোরে আনুষ্ঠানিক ভাবে পাকিস্থান প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং ভারত বিভাগ পাকাপাকি হয়ে যায়।"

স্বামী প্রণবানন্দ এই তিরিশের দশকেই সর্ব্বশক্তি নিয়োগে অত্যাসন্ন বিপর্য্যয় ঠেকাতে ব্যাপক কর্ম্মসূচী গ্রহণপূর্ব্বক হিন্দুদের সংগঠনে গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে প্রবর্ত্তন করেন হিন্দু মিলন মন্দির ও রক্ষিদল আন্দোলন। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস, চল্লিশের দশকেই প্রারম্ভেই ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ঘটে তাঁর অকাল পরিনির্ব্বাণ। ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে বাংলার সুরাবর্দ্দির মন্ত্রিত্ব কালে মুসলিম

লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের (Direct Action) ডাক এবং কলিকাতা নগরী হয় প্রথম রণক্ষেত্র। হাজার হাজার সাম্প্রদায়িক গুণ্ডার সশস্ত্র আক্রমণে কলিকাতার কালো পিচের রাস্তা রক্তে যায় লাল হয়ে। ঘটনার সূত্রপাত ১৬ই আগষ্ট এবং রক্তের হোলি চল্‌তে থাকে বেশ কয়েক দিন প্রায় নির্ব্বাধে। আত্মরক্ষায় অপ্রস্তুত হিন্দুদের কাছে এই ঘটনা ছিল আকস্মিক। পরে তারা পল্লীতে পল্লীতে আত্মরক্ষার দুর্গ গড়ে তোলে। জগবন্ধু হাই স্কুল, রামচন্দ্র হাই স্কুল, কর্পোরেশন গার্লস হাই স্কুল, হাজরা রোডে মিলিটারী পরিত্যক্ত এক ব্যারাকে এবং যাদবপুরের এক ভাড়াটিয়া বাড়ীতে আশ্রয় শিবিরে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ তিন সহস্রাধিক দুর্গতদের সেবার সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম এলাকায় আবদ্ধ মানুষদের উদ্ধার কার্য্যে আত্মনিয়োগ করে।

এই ঘটনার উত্তেজনা প্রশমনের পূর্ব্বে ঐ সালেরই ১০ই অক্টোবরে নোয়াখালি ও ত্রিপুরার বিখ্যাত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। প্রথম আক্রমণের বলি হয় করপাড়ার জমিদার রাজেন্দ্র লাল রায়চৌধুরী। অন্যূন পনর হাজার সশস্ত্র গুণ্ডা ঝাঁপিয়ে পড়ে ঐ জমিদার বাড়ীতে। পরিবারের সমস্ত পুরুষ নিহত, নারীরা নিগ্রীহিতা। অতঃপর দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র জেলায়। হাজার হাজার হিন্দু ছুটতে থাকে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে। কলিকাতা, কুমিল্লা, চাঁদপুর, নারায়ণ গঞ্জ, আসামের লামডিং প্রভৃতি স্থানে আশ্রিত বিপন্নদের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন সঙ্ঘের সন্ন্যাসী ও কর্ম্মীরা। জীবন বিপন্ন করে তাঁরা রামগঞ্জ, চৌমুহনী, লক্ষ্মীপুর, মাসিমপুর, মধুপুর, গুপ্তি, চণ্ডীপুর প্রভৃতি উপদ্রুত অঞ্চলেও শিবির স্থাপন করেন এবং অন্নবস্ত্রাদি সাহায্য দান ও উদ্ধার কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে চালাতে থাকেন ধর্ম্মান্তরিতদের শুদ্ধিকার্য্যও। সঙ্ঘের মাসিক পত্রিকার (প্রণব, ১৯৫৩) এক প্রতিবেদনে প্রকাশ সঙ্ঘ বলপূর্ব্বক বিবাহিতা ১০০ নারীর উদ্ধার, ৫০০০ ধর্ম্মান্তরিতা নারীকে শাখা-সিন্দুর দান এবং ১০,০০০ ধর্ম্মান্তরিত হিন্দুকে স্বধর্ম্মে প্রত্যানয়ন করে। ঘটনা এমনই ভয়াবহ ও মর্ম্মন্তুদ ছিল যে, মহাত্মা গান্ধীজী ছুটে আসেন নোয়াখালি,

আরম্ভ হয় তাঁর গ্রাম গ্রামান্তরে পদযাত্রা। উদ্দেশ্য—উত্তেজনা প্রশমন, শান্তি ও সৌহৃদ্দ্য স্থাপন এবং বাস্তুত্যাগীদের স্বীয় স্বীয় গ্রামে পুনর্বাসন। প্রচেষ্টা মহৎ, কিন্তু গরম হাওয়া ঠাণ্ডা হলো কৈ? কয়েক মাস পরই ভারত খণ্ডন এবং পাকিস্থানের জন্ম। পূর্ব্ব বাংলার লক্ষ লক্ষ হিন্দু সাত পুরুষের ভিটে মাটি ছেড়ে, সর্ব্বস্বান্ত ও নির্য্যাতিত হয়ে ভারতের মাটিতে শরণাগত। অভিশপ্তদের নূতন নাম হয়—উদ্বাস্তু।

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের উদার পাঁতি

নোয়াখালি দাঙ্গায় হিন্দুর যখন এই বিপর্য্যয় তখন বাংলার প্রথিতযশাঃ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা এক উদার বিধান প্রচার করেন যে, যারা বিধর্ম্মীর দ্বারা ধর্ম্মান্তরিত, কেবল মাত্র হরিনাম ও গঙ্গাস্নানের দ্বারাই তারা শুদ্ধ হবে, কোন জটিল প্রায়শ্চিত্তের আবশ্যকতা নেই। নবদ্বীপ, ভাটপাড়া, বাক্‌লা, বিক্রমপুর, কলিকাতা, কোটালীপাড়া, বৈদ্যপুর প্রভৃতি স্থানের এমন কোন বিশিষ্ট পণ্ডিত অবশিষ্ট ছিলেন না, যাঁরা এই বিধান-পত্রে স্বাক্ষর দেন নি। কলিকাতার বিখ্যাত দৈনিকগুলিতে এই সংবাদ বড় বড় শিরোনামায় প্রকাশিত হয়। বলা বাহুল্য, এই পাঁতি প্রচারের সংগঠক ছিলেন স্বামী প্রণবানন্দের আশীর্ব্বাদপ্রাপ্ত ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। যুগ-পুরুষের পন্থা অনুসরণপূর্ব্বক তৎপ্রতিষ্ঠিত সঙ্ঘ পূর্ব্বেই এ কার্য্যে তৎপর ও সফল। সুতরাং, তাৎকালিক আবশ্যকতার নিরিখে এই পাঁতির গুরুত্ব তেমন ছিল না। তথাপি বলবো বিংশ শতাব্দীর স্মৃতির এক প্রামাণিক নজির হিসাবে এর মহত্ত্ব অনস্বীকার্য্য। দেবলস্মৃতি, পরাশর সংহিতা, স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের বিধান, মহাপ্রভুর উদার নীতির সঙ্গে এই ঘোষণা এক নূতন সংযোজনা। সমাজ-বিবর্ত্তনের ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে ইহাও এক স্মরণীয় ঘটনা। ব্রাহ্মণেরা কেবলই রক্ষণশীল নহেন, সমাজরক্ষায় যুগে যুগেই তাঁরা উদার নীতির প্রবর্ত্তনেও অকুণ্ঠ।

শুদ্ধি প্রসঙ্গে স্বামী প্রণবানন্দ

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, শুদ্ধির ব্যাপারটিকে স্বামী প্রণবানন্দ তাৎক্ষণিক দৃষ্টিতে বিচার করেন নি। তাঁর মতে খৃষ্টান ও মুসলিমের দ্বারা হিন্দুদের ব্যাপক ধর্ম্মান্তর এক জাতীয় সমস্যা এবং তার আত্যন্তিক সমাধানে চাই তদনুকূল ক্ষেত্র রচনা। স্বামী প্রণবানন্দের ঘোষণা—"আগে সমাজের বন্ধ দরজা খুলে দাও, অন্ধ ও অযৌক্তির রক্ষণশীলতা দূর কর, সমাজে উদার ও গ্রহণশীল পরিবেশ গড়ে তোল। তবেই শুদ্ধির সার্থকতা। ঘরের দরজা বন্ধ রেখে বাইরের লোককে ডেকে কোন লাভ আছে? যখন দেখবে সমাজের দুয়ার বন্ধ তখন সে হতাশ চিত্তে ফিরে যাবে না কি?" আজিও হিন্দুর ধর্ম্মান্তর অবিরাম চলেছে, সমাজের রক্ষণশীলতা এখনো নির্ম্মূল হয় নি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, কোন হিন্দু কিশোরী বা যুবতী বিধর্ম্মীর দ্বারা প্রলোভিতা বা ধর্ষিতা হয়ে আর পিতৃগৃহে ফিরে আসতে চায় না, অদৃষ্টকেই আপসে মেনে নিতে চায়। কারণ, সে ধরে নেয়, হিন্দুসমাজে আর তার বিয়েই হবে না। এ রকম বহু ঘটনার প্রতিকারপ্রার্থীরা প্রায়শঃ আসেন সঙ্ঘের প্রধান কার্য্যালয়ে। সঙ্ঘের প্রচেষ্টা একেবারে নিষ্ফল হয় না। কিন্তু এরূপ ঘটনা এক মাত্র পশ্চিমবঙ্গেই ঘটছে শত শত। কয়টা ঘটনার সংবাদই বা আমাদের গোচরে আসে?

ভারতে ইসলাম ও বৃটিশের শাসনের অবসান হয়েছে, কিন্তু হয় নি ব্যাপক ধর্ম্মান্তর নিরোধ। তাই পুনরাবৃত্তি করেই বলা যায়, হিন্দুর ধর্ম্মান্তর এক জাতীয় সমস্যা। পিছিয়ে পড়া মানুষদের ভিতরে ধর্ম্মান্তর কার্য্যের বিভীষিকা দর্শনে মহাত্মা গান্ধীজী 'হরিজন' পত্রিকায় একবার লিখেছিলেন—"The object of christian missionary effort in India is to up-root Hinduism from the very fundation and replace it by another faith...if I had the power and could legislate, I should certainly stop all proselytising." কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস—ভারত ধর্ম্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্ররূপে ঘোষিত হওয়ার

সঙ্গে সঙ্গে বৈদেশিক মিশনারীরা আনন্দে নেচে উঠে। সংযুক্ত রাষ্ট্র সঙ্ঘের সভ্য Father J.D. Suza নিউইয়র্কে তাঁর ভাষণে (মার্চ, ১৯৫০) বলেন—"Under the new secular regime in India there is a wider possibility for Missionary works than before." এই সুযোগের সদ্ব্যবহারে মুসলিম মিশনও কি সক্রিয় কম? মীনাক্ষীপুরমের বার শত হরিজনের মধ্যে ছয় শতই ইসলামে ধর্ম্মান্তরিত হয় গত ১৯৮১ খৃষ্টাব্দের ১৯ শে ফেব্রুয়ারী। এই মুসলিম মিশনের লক্ষ্য ভারতের আট কোটি হরিজনকে ইসলামে দীক্ষিত করে ভারতে মুসলিমের সংখ্যাবৃদ্ধিপূর্ব্বক তাদের নিরাপত্তাকে অধিকতর সুনিশ্চিত করা। এ সম্পর্কে Arab Times (19.1.81) পত্রিকার এক প্রতিবেদনের দলিল আমাদের হাতে আছে। প্রতিবেদনের কিছু অংশ তুলে ধরছি, তাতেই অনুমিত হবে খৃষ্টানদের ন্যায় মুসলমানও হিন্দুর ধর্ম্মান্তরে পিছিয়ে থাকতে চায় না। লণ্ডনের ইসলামিক কালচারাল সেন্টারের ঘোষণা—"There is an opportunity to attract more than 80 million "Harijan Hindus" who are facing attempts to force them to leave this creed and to chose other religion."

তা হলেই ভাবুন—স্বাধীন ভারতে হিন্দুদের অবস্থাখানা কি? মহাত্মা গান্ধীজী কি তবে নিতান্তই অরণ্যে রোদন ক'রে গেছেন? এই গণ-ধর্ম্মান্তর প্রতিরোধে নোয়াখালির ন্যায় গণশুদ্ধি আন্দোলনের প্রয়োজন। কিন্তু তজ্জন্য অগ্রে চাই তদনুকূল ক্ষেত্র রচনা। নচেৎ ফিরে আসা মানুষদের স্থান হবে কোথায়? তাই স্বামী প্রণবানন্দের উপদেশ—"আগে সমাজের রুদ্ধ দরজা খুলে দাও।"

দশম অধ্যায়

স্বাধীন ভারত ও হিন্দু-সমাজ (১৯৪৭-৯৬)

১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ আগষ্ট কলিকাতায় মুসলিম লীগের রক্তাক্ত প্রত্যক্ষ সংগ্রামের প্রাণঘাতী মর্ম্মন্তুদ ঘটনা, আর তার ঠিক এক বৎসরের মধ্যে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ভারত খণ্ডন সম্পূর্ণ। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পাঞ্জাবের কিছু অংশ এবং সমগ্র সিন্ধুপ্রদেশ নিয়ে গঠিত হয় পশ্চিম পাকিস্থান, আর বঙ্গের অধিকাংশ পূর্ব্বাঞ্চল ও উত্তরাঞ্চলের কিছু অংশ এবং আসামের শ্রীহট্ট জেলার বিশেষ অঞ্চল নিয়ে গঠিত হয় পূর্ব্ব পাকিস্থান; মধ্যখানের বড় অংশ নিয়ে রচিত হয় খণ্ডিত ভারত রাষ্ট্র। ভারত রাষ্ট্রে মুসলিমরা রইলো নিরাপদ আশ্রয়েই, কিন্তু পশ্চিম পাকিস্থান, কি পূর্ব্ব পাকিস্থান উভয় অঞ্চলেই হিন্দুদের ধন-প্রাণ-মান বিপন্ন। ফলে উদ্বাস্তু অভিধা মাথায় নিয়ে পাকিস্থানের কোটি কোটি হিন্দু আশ্রয়ের সন্ধানে ভারতের মাটিতে। ভারত রাষ্ট্র নীতিগত প্রতিশ্রুতি পালনে এই বিপুল সর্ব্বহারাদের আশ্রয় দিয়েছে। দিয়েছে অন্নবস্ত্র, দিয়েছে পুনর্বাসন, দিয়েছে সাধ্যমত জীবিকার সংস্থান।

উদ্বাস্তু হিন্দু ও শিখদের করুণ দুর্দ্দশা

এই দেশ বিভাগের অভিশাপ সর্ব্বপ্রকার মানবিক বোধকে পায়ে দলে কোটি কোটি মানুষকে শুধু পিতৃপুরুষ পরম্পরাগত ভিটে মাটি ছাড়াই করে নি, করেছে তাদের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন, খুন হয়েছে অগণিত, লক্ষ লক্ষ নারীর ঘটেছে বর্ব্বরোচিত সতীত্ব নাশ। হায়, কি কষ্ট!

পশ্চিম পাকিস্থানের হিন্দু ও শিখেরা মিলিত ভাবে লড়াই করতে করতে ভারতে এসে অনেক ক্ষেত্রেই নিজেদের মাথা গোঁজার ঠাঁই নিজেরাই করে নিয়েছে, আর পূর্ব্ব পাকিস্থানের ভীরু, দুর্ব্বল, অসংগঠিত হিন্দুরা এসেছে এক তরফা মার খেতে খেতে ধন,

প্রাণ, ইজ্জৎ খুইয়ে। তাই পূর্ব্ব পাকিস্থানের হিন্দুদের নিয়েই ভারত সরকারকে বিব্রত হতে হয়েছে অধিক। স্বামী প্রণবানন্দ তারস্বরে বার বার হিন্দুদের সংগঠিত হতে বলেছেন, উপদেশ দিয়েছেন আত্মরক্ষার শক্তি সঞ্চয়ে, তুলে ধরেছেন তাদের কাছে সময়োচিত কর্ম্মপন্থা। কিন্তু কাপুরুষ, নিশ্চেষ্ট হিন্দুরা কর্ণপাত করে নি, আর ভ্রান্ত জাতীয়তাবাদীরা সেধেছে বাদ। তাই তো পরিশোধ করতে হয়েছে এই চরম মূল্য।

বিভক্ত ভারতেও হিন্দুরাষ্ট্র হলো না

আশা করা গিয়েছিল, মুসলমানরা দেশ ভাগ ক'রে নিয়ে যখন পৃথক্ ঐশ্লামিক রাষ্ট্র গঠন করলো, তখন ভারতে নিশ্চয়ই হবে হিন্দুরাষ্ট্র। কিন্তু দুর্ভাগ্য, তা, হলো না। এত কাণ্ডের পরও তথাকথিত জাতীয়তাবাদের ভূত নেতাদের ঘাড় থেকে নামলো না, করলেন তাঁরা উল্টোটা। ভাবলেন—ধর্ম্ম নিয়েই তো এত বিবাদ, দাও রাষ্ট্রবাদ থেকে ধর্ম্মকে নির্ব্বাসন, গঠন কর অবশিষ্ট ভারতে ধর্ম্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র, দাও দাগী সাম্প্রদায়িক মানুষদের ঢালাও সুযোগ সুবিধা, যাতে ভবিষ্যতে জাতীয় সংহতিতে আর ফাটল না ধরে। হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টান প্রভৃতি সর্ব্বসম্প্রদায়কে নিয়ে এক অখণ্ড ঐক্যবদ্ধ মহাজাতীয়তার রচনার দুঃস্বপ্ন দেখলেন নেতারা। কিন্তু কার্য্যতঃ কি হলো? সফল হলো কি এই সুখস্বপ্ন? স্বাধীনতার অর্দ্ধশতাব্দী উত্তীর্ণ। কই সেই জাতীয় মহৈক্য? ক্ষমতালোভীরা দলে উপদলে তস্য উপদলে ছিন্নভিন্ন, সাম্প্রদায়িক সংখ্যালঘুতোষণে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরিলিপ্ত, সংখ্যালঘুদের দাবীও বাড়ছে দফায় দফায়, যত্রতত্র ফাটছে বিধ্বংসী বোমা, ভারতের ভিতরে ও বাইরে প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে চলছে ভারতকে আর একটা চূড়ান্ত আঘাত হানার ষড়যন্ত্র, কাশ্মীরের লক্ষ লক্ষ হিন্দু স্বাধীন দেশেও উদ্বাস্তু, প্রতিবেশী পাকিস্থান উদ্দেশ্যমূলক ভাবে অস্ত্রসম্ভার বাড়িয়ে তুলছে,—সমস্ত চিত্রটা বিভীষিকাময়। ধর্ম্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র কি দিল ভারতকে?

স্বাধীন ভারতে সমাজ-কল্যাণ কার্য্য

স্বাধীনোত্তর কালে আমরা ভাল যা কিছু পেয়েছি, তা একান্তই বৈষয়িক। সন্দেহ নেই, এ দেশের সমস্যা অশেষ। আছে দারিদ্র্য ও অশিক্ষা, আছে সাম্প্রদায়িক কলহ, আছে রাজনৈতিক কোন্দলের কদর্য্য বহর, আছে কুসংস্কার ও দুর্নীতির পাহাড়, যাঁরা দেশকে নেতৃত্ব দিবেন তাঁদের চরিত্রের পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধেও মানুষের অভিজ্ঞতা হতাশাব্যঞ্জক, সরকারী উন্নয়নের টাকার লুঠতরাজ চলছে ডাইনে বাঁয়ে। তথাপি তার ভিতর দিয়েও বিগত অর্দ্ধশতাব্দীতে কৃষি, বিজ্ঞান, শিক্ষা, পরিবহন, অনুন্নতদের উন্নয়ন, পূর্ত্তকর্ম্ম, সামাজিক সংস্কার, প্রতিরক্ষা, সমাজ-কল্যাণের বহুবিধ পরিকল্পনা রূপায়ণ প্রচেষ্টাও হয়েছে। দেশে পরিচ্ছন্ন ও দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন থাকলে আরো বেশী হতে পারতো।

অনুন্নত ও উপজাতীয় কল্যাণ

ইংরাজ সরকার হিন্দুদের ভাগ করে দিয়ে গিয়েছিল মুখ্য তিন শ্রেণীতে—বর্ণহিন্দু, তপশীলী হিন্দু এবং উপজাতীয় গোষ্ঠী। পূর্ব্বেই আলোচিত হয়েছে—ইংরাজের উদ্দেশ্য ছিল শুধু বিভেদ সৃষ্টি করা —অনুন্নত ও অবহেলিতের জন্য বাস্তবে তারা কিছুই করে নি। কিন্তু স্বাধীন সরকার এ ক্ষেত্রে কিছু ভাল কাজ দেখাবার চেষ্টা করেছেন। সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়ের মন্ত্রিত্বকালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বর্ত্তমান গ্রন্থের লেখক প্রথমে জেলা স্তরে তারপর রাজ্যস্তরে উপজাতীয় কল্যাণ বিভাগের পরামর্শদাতা সমিতির (Advisory Board) সদস্য ছিলেন। তপশীলী হিন্দুর উন্নয়ন দপ্তরটি একই মন্ত্রকের অধীন হওয়ায় এই সময় এই বিভাগের প্রকল্পগুলিও অতি কাছ থেকে দেখার সুযোগ ঘটেছিল। পশ্চিমবঙ্গে সাঁওতাল, মাহিলি, ওরাং, লোধা বা শবর জাতীয় উপজাতীয়দের বাস অধিক। তপশীলীদের ভিতরে নমঃশূদ্র, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, ব্যগ্রক্ষত্রিয়, রাজবংশী, শৌণ্ডিক, ঋষিদাস, কাওরা, হাঁড়ি, বাউরি প্রভৃতি অসংখ্য জাতি বর্ত্তমান। প্রশ্ন—সরকারী

সুযোগ-সুবিধাগুলির সদ্ব্যবহারে আজো পর্য্যন্ত সকল উপজাতীয় এবং সকল তপশীলীরা কি সমান সমর্থ হয়েছে? উপজাতীয়দের ভিতরে সাঁওতালেরা যতটা নিতে পেরেছে, লোধারা বিশেষ সুবিধা পেয়েও তা নিতে পারে নি। তপশীলী হিন্দুদের ভিতরে নমঃশূদ্র, পৌন্ড্রক্ষত্রিয় প্রভৃতি কিছু সম্প্রদায় যতটা এগিয়ে, কাওরা, বাগ্দী, মুচি, বাউরিরা ততদূর নয়। শিক্ষা ও চাকুরীর ক্ষেত্রে এদের জন্য সমান সুবিধা, কিন্তু শিক্ষার অভাবে চাকুরীতে নিম্নতরদের স্থান নিতান্ত নগণ্য। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হয়েছিল, বর্তমানে O. B. C. বা other backward class এর হিন্দুরা মণ্ডল কমিশনের সুপারিশের সুবাদে এই সকল সুবিধার এক বিশেষ অংশীদার। সম্প্রতি খৃষ্টান ও মুসলমান সম্প্রদায়ের এক অংশ দলিতদের সমান সুবিধা নেওয়ায় উদ্যোগী। অথচ পৃথিবীর কোথাও এই দুই সমাজে উচ্চনীচ বর্ণভেদের নামগন্ধও নেই। এই দরিদ্র দেশে ব্রাহ্মণ, কায়স্থদের মধ্যেও দুর্দ্দশা কি কম? তবু, বলবো কতকগুলি চিহ্নিত সম্প্রদায়কে বিশেষ সুবিধা-সুযোগ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অবশ্য আছে। কিন্তু তা নিয়ে যে ভেদাভেদ, রাজনৈতিক উস্কানি ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা তা কি সমর্থন-যোগ্য? সমাজ আরো ভেঙ্গে যাচ্ছে না?

লোধাদের কথা উঠেছিল। বৃটীশ আমলে এরা চিহ্নিত ছিল Criminal Tribe বা অপরাধপ্রবণ উপজাতিরূপে। বহু প্রাচীন কাল থেকেই চুরি ও দস্যুবৃত্তিই এদের বংশানুক্রমিক জীবিকা। সারা ভারতে এই রকম দস্যুজাতির অস্তিত্ব পুরাণ, মহাভারতেও পাওয়া যায়। এই সকল অপরাধপ্রবণ জাতির সংশোধন ও উন্নয়নের কোন রাজকীয় উদ্যম প্রাচীনকালে ছিল কি না তা জানা যায় না। তবে দস্যুদের ভিতরেই কখনো কখনো নীতিপরায়ণ নেতা ও সংস্কারক দেখা গেছে। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে (১৩১শ অধ্যায়) দস্যু কায়ব্য এমনি এক সংস্কারক নেতা। ইনি নিজে বীর হয়েও ধার্ম্মিক, পিতৃমাতৃভক্ত, বানপ্রস্থী ও সন্ন্যাসীদের ভক্ত ও সেবক। দস্যু স্বজাতিদের প্রতি কায়ব্যের শিক্ষা—"তোমরা স্ত্রী, ভীত, বালক ও তপস্বীকে হত্যা করবে না, যারা তোমাদের সঙ্গে লড়তে আসবে

না, তাদিগকে বধ করবে না, তোমরা জোর করে মেয়েদের গ্রহণ করবে না। শুধু মানুষী স্ত্রী নয়, কোন স্ত্রীপ্রাণীকেই বধ করবে না। ব্রাহ্মণদের রক্ষা করতে যুদ্ধ করবে। ক্ষেত্রের শস্য হরণ করবে না, বিবাহাদি উৎসবে বিঘ্ন সৃষ্টি করবে না, যেখানে দেবতা, অতিথি ও পিতৃগণের পূজা হয় সেখানে গিয়ে কোন উপদ্রব সৃষ্টি করবে না। তোমরা একস্থানে বসেই দস্যুবৃত্তির ফল লাভের চেষ্টা কর। যে সকল ব্যবসায়ী স্বেচ্ছায় ধনদান করবে না, কেবল তারাই হবে আক্রমণের লক্ষ্য। আরো আশ্চর্য্য! কায়ব্যের উক্তি—যারা রাষ্ট্রের ক্ষতি ক'রে নিজের উন্নতি চায়, তারা মৃতদেহে উৎপন্ন কৃমির ন্যায় ঘৃণ্য। তারা তৎক্ষণাৎ বধ্য।* দস্যুরও কি অভাবনীয় রাষ্ট্রপ্রীতি!

গল্পটা পৌরাণিক। কিন্তু দস্যু নামক জাতির পরম্পরা যে ঐতিহাসিক তার প্রমাণ এই অপরাধপ্রবণ লোধারা এবং যারা ভারতে আরো এরূপ কিছু কিছু উপজাতি। যুগ যুগ ধরেই এরা অবহেলিত। বৃটীশেরা এদের ধরে শুধু ঠেঙ্গিয়েছে, কারণ এরা Criminal। স্বাধীন ভারত সরকার কিন্তু এই অপরাধপ্রবণ জাতিদের কল্যাণে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন—প্রত্যাহার করেন তাদের নামের পূর্ব্বের Criminal বিশেষণটি। লোধারা Ex-criminal Tribe। সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনার জন্য তাদিগকে দেওয়া হয় বাসের জন্য ঘর, চাষের জন্য জমি, শিক্ষার জন্য স্কুল, স্বনির্ভরতার জন্য হাতের কাজ শিক্ষা। গড়ে উঠে সরকারী ও বে-সরকারী প্রচেষ্টায় বেশ কিছু লোধা কলোনী। একটির দায়িত্ব গ্রহণ করে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ—ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুরে। কিন্তু এ সকল লোধা কলোনীর বাইরেও এই সম্প্রদায়ের বহু মানুষ আজো অন্ধকারে। কলোনীর লোধারাও এখনো গুছিয়ে সংসার করার মানসিকতা অর্জ্জন করতে শিখে নি—এ উক্তি অভিজ্ঞতালব্ধ। আবার আপনারা কি ভাবতে পারেন —এই ভারতেই অদ্যাপি এমন বন্য যাযাবর মানুষের বাস আছে যারা অর্দ্ধনগ্ন, গভীর জঙ্গলে বাস, বনের পশু-পক্ষী মেরে খায়,

* যে চ রাষ্ট্রোপরোধেন বৃদ্ধিং কুর্ব্বন্তি কেচন।
তদৈব তেহনুমার্য্যন্তে কুণপে কৃময়ো যথা।।

কৌশলে ফাঁদ পেতে বানর ধরে, আর ঐ বানরের পোড়া বা অর্দ্ধসিদ্ধ মাংসই তাদের প্রিয় খাদ্য, অপুষ্টি ও অকালমৃত্যু তাদের ভাগ্যের লিখন? এমনই এক শ্রেণীর বন্য মানুষ বিহারের জঙ্গলের বীরহোড় জাতি। সিংভূম জেলার রঙ্গনবেড়া, টাটিবা, লরহাই, বোকোমডিহির বনাঞ্চলে এদের বাস। লোকালয়ে বড় একটা আসে না। জানা মাত্রই ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ এই মানুষদের ভিতরে কল্যাণ কার্য্য আরম্ভ করে। এদের জন্য প্রয়োজন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জীবিকা ও আবাসন। এজন্য সরকারী সহযোগিতা একান্ত আবশ্যক। সঙ্ঘের টাটানগর আশ্রমে এবং দাবাঙ্কি কল্যাণকেন্দ্রে স্কুল ও ছাত্রাবাসে সাঁওতাল, মুণ্ডা, হো, মাহালি, খেড়িয়া ছাত্রদের সঙ্গে বীরহোড় ছেলেরাও সমান সুযোগ পাচ্ছে। এতদ্ব্যতীত গুজরাট প্রদেশের ডেডিয়াপাড়ায়, বিহারের ঘাটশীলা অঞ্চলে বরাজুড়িতে, মেদিনীপুর জেলার পুকুরিয়া ও ডোকরা গ্রামে, পুরুলিয়া জেলার রঘুনাথপুর ও অযোধ্যা পাহাড়ে এবং উত্তরবঙ্গের বেশ কয়েকটি অঞ্চলে সঙ্ঘ উপজাতীয় কল্যাণকর্ম্মে ব্রতী। পুনঃ সারা ভারতে তপশীলীদের ভিতরেও সঙ্ঘের কর্ম্মের পরিধি কি কম? আমরা রিপোর্ট লিখতে বসি নি, সুতরাং বিস্তৃত সমাচারে যাব না। তবে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার কাওরা সম্প্রদায়ের উল্লেখ না করে পারছি না। এই তপশীলী মানুষগুলি উচ্চ বর্ণের দৃষ্টিতে ছিল খুবই ঘৃণ্য ছোট জাত। সঙ্ঘ প্রতিটি কাওরা পল্লীতে কর্ম্মকেন্দ্র (হিন্দু মিলন মন্দির) স্থাপনপূর্ব্বক এই সম্প্রদায়কে এরূপ পরিমার্জ্জিত করে তুলতে পেরেছে যে, কাওরা নামে তেমন দুর্গন্ধ আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। এদের ভিতরে চাই আরো শিক্ষা ও জীবিকার সুবিধা। সে দায়িত্ব তো মুখ্যতঃ সরকারের। বসিরহাটে ঋষিদাস উদ্বাস্তুরা সরকারী পুনর্বাসিনে বঞ্চিত। সঙ্ঘ জমি কিনে গড়ে দিয়েছে প্রণবপল্লী নামে এক কলোনী।

আবার কেউ কি জানেন, এই পশ্চিমবঙ্গের ২৪ পরগণা, হুগলী, হাওড়া, মেদিনীপুর, বর্দ্ধমান, মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া, বীরভূম জেলায় চিত্রকর বা পটুয়া নামে এমন এক সম্প্রদায়ের বাস যারা ইতিহাসের অভিশাপে খিচুড়ি ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হতে বাধ্য হয়? সুদূর অতীতের

ব্রাহ্মণেরা চিত্রের সামান্য ব্যতিক্রমের জন্য এই সম্প্রদায়কে পাতিত করে অন্যায় ভাবে।* ফলে পুরোহিতের অভাবে এই ব্রাহ্মণপিষ্ট ব্রাত্য মানুষগুলি বিবাহ ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় মৌলবীর সাহায্য নিতে বাধ্য হয়। অথচ, আচারে, বিচারে, বিশ্বাসে এরা হিন্দুই। দেবদেবীর পট অঙ্কন ও মূর্ত্তিগড়া এদের জাতীয় বৃত্তি। বাংলা পঞ্চাশ সালের দুর্ভিক্ষ সেবাব্রতের সূত্রে এই সম্প্রদায়ের ত্রিশঙ্কু দুর্দ্দশা প্রথমে সঙ্ঘের নজরে আসে। অক্লান্ত শ্রমে প্রতি চিত্রকর পল্লীতে হিন্দু পুরোহিতের ব্যবস্থাপূর্ব্বক এবং শুদ্ধিযজ্ঞের অনুষ্ঠানে এই মানুষগুলিকে হিন্দুসমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনা হয়। এরা আজ সুখী। কেউ কেউ সুপ্রতিষ্ঠিত। উচ্চবর্ণের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধের দৃষ্টান্তও বিরল নয়। মাত্র অল্পসংখ্যক রক্ষণশীল পটুয়া ইসলামে মিশে গেছে।

অছুঁৎদের সামাজিক অযোগ্যতা দূরীকরণ আইন

এই আইনের প্রসঙ্গ পূর্ব্বেই একবার উঠেছিল। প্রাক্ সাংবিধানিক যুগেই রাজ্যে রাজ্যে এরূপ কিছু আইন প্রবর্ত্তিত হয়েছিল। যথা—বম্বের The Bombay Harijan (Removal of Social Disabilities) Act, 1946, উত্তরপ্রদেশের U.P. Removal of Social Disabilities Act (1947), বিহারের Harijan (Removal of Civil Disabilities) Act, 1949 এবং পশ্চিমবঙ্গের West Bengal Hindu Social Disabilities Removal Act, 1948. অতঃপর ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দে ভারতের লোকসভা কর্ত্তৃক সংবিধানসম্মত ভাবে প্রবর্ত্তিত হয় Untouchability (offences) Act। ফলে প্রাক্ সাংবিধানিক কালের বিভিন্ন প্রাদেশিক সামাজিক অযোগ্যতা দূরীকরণ আইনগুলির স্বতন্ত্র প্রয়োজনীয়তা আর থাকে না। সংক্ষিপ্ত ভাষায় আইনের বয়ান এইরূপ—সাধারণের ব্যবহার্য্য কূপ, পুষ্করিণী, প্রমোদের স্থান, হোটেল,

* ব্যতিক্রমেণ চিত্রানাং সদ্যশ্চিত্রকরস্তদা।
পতিতো ব্রহ্মশাপেন ব্রাহ্মণাঞ্চ কোপতঃ।।

—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, প্রকৃতিখণ্ড

মন্দির, তীর্থাদি স্থানে হিন্দুমাত্রেরই ব্যবহারযোগ্যতা ও প্রবেশাধিকার থাকবে। পুরোহিত, রজক, ক্ষৌরকার প্রভৃতি হিন্দুমাত্রেরই যজন কার্য্যে বাধ্য। অস্পৃশ্য ও ছোট জাত ব'লে কেউ যদি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, তবে তা আইনতঃ অপরাধ এবং অপরাধীর জেল ও জরিমানা দুইই হবে। আইনের অভিপ্রায় তো ভাল। কিন্তু আইনের অধিকার আদায়ের জন্য কয় জন দরিদ্র, অশিক্ষিত, অজ্ঞ মানুষের ক্ষমতা আছে আদালতে যাবার? তাদের অর্থবল ও সহায়-সম্বলই বা কোথা? ফলে আইন আছে, কিন্তু বন্ধ্যা। শুধু আইন দ্বারা কি সামাজিক অযোগ্যতা দূরীকরণ করা যায়, যদি না কোন উপযোগী গঠনমূলক কর্ম্মের পরিকাঠামো থাকে? স্বামী প্রণবানন্দ এই প্রশ্নটিই ভেবেছেন সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের আদি কাল থেকে।

পণপ্রথা নিরোধ আইন

ঠিক এমনি বন্ধ্যা দশা ঘটেছে এই আইনেরও।* পণ গ্রহণ দূরের কথা, পণের প্রস্তাব পর্য্যন্ত ফৌজদারি অপরাধ। এতেও আছে কঠোর জেল ও উচ্চ জরিমানা। কিন্তু কোন কন্যার পিতা বা অভিভাবক এই প্রশ্নে আদালতে গেছেন বা পুলিশে ডায়েরি করেছেন এমন দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায় কি? তা হলে তো মেয়ের বিয়েই হবে না। কন্যাদায়ের যন্ত্রণা হবে দুর্ব্বিসহ। ফলে বরপণ দাপিয়ে চলেছে বহাল তবিয়তেই। যোগ্যতা অনুযায়ী বরের মূল্য আগুন। শুনেছি, ধনকুবের সম্প্রদায়ে এক এক বরের মূল্য কোটি টাকাও হয়, নচেৎ Status থাকে না। শুনলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠে। স্মৃতিকারগণ এ প্রথাকে বলেছেন অপত্যবিক্রয়রূপ মহাপাতক —এতে নরকগামী হতে হয়। কিন্তু লোভী মানুষেরা নিঃশঙ্কে চালাচ্ছে এই ঘৃণ্য ছেলে বিক্রয়ের ব্যবসায়। হায় রে! হিন্দু-সমাজ!

কিন্তু কেউ কি জানেন এই বাংলারই প্রেমাবতার মহাপ্রভু তদীয় প্রথমা পত্নী লক্ষ্মীদেবীকে বিবাহ করেন মাত্র পাঁচটি হরিতকী যৌতুক

* The Dowry Prohibition Act (1961) এবং The Dowry Prohibition West Bengal (Amendment Act) 1975

নিয়ে? লক্ষ্মীদেবীর পিতা বল্লভ আচার্য্য। গরীব ব্রাহ্মণ। প্রভুর গর্ভধারিণী শচীদেবীকে তিনি নিজ অক্ষমতা জানিয়ে বলেন—"কন্যা মাত্র দিব পঞ্চ হরিতকী দিয়া।" শচীদেবী চেয়েছেন—মানুষ, চেয়েছেন গৃহলক্ষ্মী, তিনি অর্থবিত্ত চান নি। অধুনা কোথায় গেল সেই আদর্শ? আসলে মানুষের ভিতরে আত্মিক বিবেক, সত্যকার সমাজ-চেতনা ও মানবিক নীতিবোধ জাগিয়ে দিতে না পারলে এই পাপ দূরীভূত হওয়ার নয়। কিন্তু রাষ্ট্রীয় পর্য্যায়ে সেই উদ্যোগ কোথা? ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ কিন্তু এই অনাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে চায়। "পণপ্রথা সমাজের কলঙ্ক" পুস্তিকাখানি এই উদ্দেশ্যেই সঙ্ঘ থেকে রচিত ও বহুল প্রচারিত। এতে অনেক মানুষের চোখ খুলে যাওয়া উচিত।

হিন্দুকোড বিলের কথা

স্বাধীন ভারত সরকার হিন্দুদের জন্য যে সামাজিক বিশেষ উপহারটি দিয়েছেন তার নাম হিন্দু কোড বিল। হিন্দুর বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদ (১৯৫৫), দত্তক গ্রহণ (১৯৫৬), সম্পত্তির উত্তরাধিকার (১৯৫৬) এবং নাবালকের আইনসঙ্গত অভিভাবকত্ব নির্ণয় (১৯৫৬)—মোটামুটি এই কয়টি বিষয় হিন্দুকোড বিলের মূল মর্ম্ম। বিলটি নিয়ে তুমুল বিতর্কের ঝড় উঠেছিল। রাষ্ট্র তো ধর্ম্মনিরপেক্ষ। তা হলে মুসলমান ও খৃষ্টানকে রেহাই দিয়ে শুধু হিন্দুর ব্যক্তিগত আইনে হস্তক্ষেপ করা কেন? সর্ব্ব সম্প্রদায়ের জন্য এক সাধারণ সামাজিক আইন কেন নয়? ভারতের সংবিধানের ৪৪ অনুচ্ছেদে তা স্পষ্ট বলা হয়েছে—"The state shall endeavour to secure for the Citizens a uniformed Civil Code throughout the territory of India." কিন্তু তা করা হচ্ছে না, সুপ্রিমকোর্টের সাম্প্রতিক নির্দ্দেশ সত্ত্বেও নয়।* মুসলিম ও খৃষ্টানদের ব্যক্তিগত

* সরলা মুদ্‌গল বনাম ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র (১৯৯৫)৩ এস্ সি. সি. ৬৩৫-কুলদীপ সিং এবং সহায় জে. জে. (১০ই মে, ১৯৯৫) মামলার রায় দিতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন—"যখন আশি শতাংশের অধিক নাগরিক একটি বিধিবদ্ধ

আইনে আঁচড়টি পর্য্যন্ত না দিয়ে কেবল হিন্দুদের ব্যক্তিগত আইনে হস্তক্ষেপ করা কি সঙ্গত? মুসলিমরা চারটি নিকাহ করতে পারবে, তিন তালাকে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে যাবে। কিন্তু হিন্দুর মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে যা বিশেষ ভাবে নিষিদ্ধ, সেই বিবাহ-বিচ্ছেদ বিধানও চালু করা হয়েছে উক্ত বিলে। তুমুল বিতর্ক সত্ত্বেও ভোটাধিক্যে বিলটি পাশ হয়ে যায়।

হিন্দুকোড বিলের সংক্ষিপ্ত পর্য্যালোচনা

এই বিলে অনেক ক্ষেত্রে সংহিতাদি গ্রন্থের অভিপ্রায় রক্ষিত হয়েছে বটে, কিন্তু লঙ্ঘিত হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে। আপত্তি সেইখানে।

অপুত্রকের দত্তক গ্রহণ হিন্দুসমাজে চিরাচরিত। পূর্ব্বে দত্তক গ্রহণ করা হতো সাধারণতঃ শোণিতসম্পর্ক থেকে এবং ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠানের দ্বারা। দত্তক সন্তানদের অধিকতর নিরাপত্তার জন্য অধুনা আইনের বন্ধন কিছু দৃঢ়। যিনি দত্তক দিবেন এবং নিবেন উভয়েরই আইনসম্মত যোগ্যতা থাকা চাই। শোণিতসম্পর্ক বা সাবর্ণ্যগত সম্পর্ক অপরিহার্য্য নয়। দত্তক গ্রহণযোগ্য পুত্র বা কন্যা হিন্দু হলেই হলো এবং তাদের বয়স ১৫ বৎসরের ঊর্দ্ধে হবে না। প্রতিটি দত্তক গ্রহণ করতে হবে আইনানুগ ভাবে রেজেষ্ট্রীপূর্ব্বক এবং দত্তক সন্তান সম্পত্তির উত্তরাধিকার পাবে।

হিন্দুর উত্তরাধিকার বিলে মন্বাদির উপরম স্বত্ববাদই (দায়ভাগ) গৃহীত, যাজ্ঞবল্ক্যের জন্মস্বত্ববাদ বা মিতাক্ষরা নয়। কিন্তু বৈপ্লবিক

ব্যক্তিগত আইনের আওতায় আসতে পেরেছেন, তখন অভিন্ন দেওয়ানী বিধি প্রণয়ন না করার কোন যুক্তি থাকতে পারে না। হিন্দুরা শিখ, বৌদ্ধ ও জৈনদের সঙ্গে জাতীয় ঐক্য সংহতির জন্য নিজেদের আবেগকে ত্যাগ করতে পারলেও অন্যান্য সম্প্রদায়েরা পারেন নি।"

সেই সঙ্গে বিচারপতি সিং বলেছেন,—"যারা দেশ বিভাগের পরেও ভারতে থাকতে পছন্দ করেছেন, তাঁরা ভালই জানতেন যে, ভারতীয় নেতারা দ্বিজাতি বা ত্রিজাতিতত্ত্বে বিশ্বাস করতেন না...এবং ধর্ম্মের ভিত্তিতে কোন সম্প্রদায় পৃথক্ থাকার দাবী করতে পারেন না।"

পরিবর্ত্তন এই যে, পিতার মৃত্যুর পর পুত্রদের সহিত কন্যারা এবং বিধবা পুত্রবধূ পিতৃধন ও পিতৃসম্পত্তির সমান অংশ পাবে। বিধবা পত্নী তো পাবেই। বসত বাটীতে কন্যারা মাত্র বাস করতে পারবে, কিন্তু কোনরূপ হস্তান্তর করতে পারবে না, বা বণ্টন নামার দাবীও করতে পারবে না। কিন্তু সর্ব্বসম্মতিক্রমে ঐ বাড়ীটি বিক্রয় করা হলে পুত্র-কন্যারা বিক্রয়লব্ধ ধনের সমান অংশ পাবে। কিন্তু সুপ্রিমকোর্টের এক রায়ে বোনেরা ভাইদের কাছ থেকে বসত বাটীর নিজ অংশ বাঁটোয়ারা করে নেওয়ারও অধিকার পেয়েছে। ফলে এই বিধানের দ্বারা হিন্দুর সংসারে এতদিনের পোষিত ভাই-ভগ্নীর ভিতরে যে মধুর প্রীতিসম্পর্ক ছিল তা কি ব্যাহত হলো না? অবশ্য এখন পর্য্যন্ত উদারহৃদয়া বোনেরা ভাইদের অনুকূলে আবশ্যক সহি-সাবুত ক'রে দিয়ে ভবিষ্য বিবাদ মিটিয়ে নেয়। আবার বহুক্ষেত্রে বিবাদও হয় এবং সেই বিবাদ আদালত পর্য্যন্ত গড়ায়। এতদিন ছিল ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই, এখন হতে চলেছে ভাই বোন ঠাঁই ঠাঁই।

প্রশ্ন যে, স্মৃতিশাস্ত্রের বিধান ভেঙ্গে এই ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা কি সত্যই ছিল? আইনপ্রণেতারা কি মেয়েদের ভবিষ্য অর্থনৈতিক নিরাপত্তার কথা বেশী ভেবেছেন? মেয়েরা তো মৃত পতির সূত্রেই সম্পত্তি ভোগের অধিকার পাচ্ছে। তবে কন্যাদের এ ক্ষেত্রে টেনে এনে জটিলতার সৃষ্টি কেন? আমাদের জানা ভাল যে, হিন্দুর সংহিতাশাস্ত্রকারগণ স্ত্রীজাতির ভবিষ্য অর্থনৈতিক নিরাপত্তার বিষয়ে একান্ত অন্ধ ছিলেন না। মনু ছয় প্রকার স্ত্রীধনের কথা বলেছেন —অধ্যগ্নি, অধ্যাবাহনিক, প্রীতিদত্তধন এবং অন্য তিনটির মধ্যে পড়ে পিতৃদত্ত ধন, মাতৃদত্ত ধন, ভ্রাতৃদত্ত ধন প্রভৃতি। বিবাহ হোমকালে লব্ধ যে ধন, তা অধ্যগ্নি ধন, পতিগৃহে যাত্রাকালে লব্ধ ধন—অধ্যাবাহনিক বা ব্যবহারিক ধন। রতিকালে বা অন্য সময়ে পতিকর্ত্তৃক প্রীতি সহকারে প্রদত্ত ধন—প্রীতিদত্ত ধন, আর বিবাহের পর পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভর্ত্তা, পিতৃকুল, মাতৃকুল ও ভর্ত্তৃকুল থেকে প্রাপ্ত যে ধন, তা অন্বাধেয় ধন। মনু পরিষ্কার বলেছেন—"স্ত্রীধন গ্রহণে পাপ ও অধোগতি (৩।৫২)। মৃত্যুর পর স্ত্রীধনের উত্তরাধিকার

পুত্র ও কন্যাগণের সমান অংশে, বিবাহিতা কন্যার অন্যের তুলনায় এক চতুর্থাংশ। নিঃসন্তানা স্ত্রীধনের অধিকারী জীবিত পতি। কিন্তু আসুর, রাক্ষস ও পৈশাচবিবাহ লব্ধ স্ত্রীধন নিঃসন্তানা স্ত্রীর মাতা বা তদভাবে পিতার প্রাপ্য। তা হ'লে প্রশ্ন জাগে—হিন্দুবিবাহ কত প্রকার?

হিন্দুশাস্ত্র মতে বিবাহ আটপ্রকার

হিন্দুশাস্ত্র আটপ্রকার বিবাহের কথা বলেন। যথাঃ—ব্রাহ্মবিবাহ, দৈববিবাহ, আর্ষবিবাহ, প্রাজাপত্য বিবাহ, আসুর বিবাহ, গান্ধর্ব্ব বিবাহ, রাক্ষস বিবাহ এবং পৈশাচ বিবাহ। শাস্ত্রবিদ্ পাত্রকে পূজা সহকারে কন্যাদান—**ব্রাহ্মবিবাহ,** যজ্ঞে বৃত ঋত্বিককে সালঙ্কারা কন্যাদান—**দৈববিবাহ,** এক বা দুটি গোমিথুন গ্রহণপূর্ব্বক বরকে কন্যাদান **আর্ষবিবাহ,** 'উভয়ে মিলে ধর্ম্মাচরণ কর' এই বাক্য উচ্চারণপূর্ব্বক সম্মানের সহিত কন্যাদান—**প্রাজাপত্য** বিবাহ, শুল্ক গ্রহণপূর্ব্বক কন্যাদান—আসুর বিবাহ, বর ও কন্যার পরস্পর ভালবাসার দ্বারা বিবাহ—**গান্ধর্ব্ব** বিবাহ, যুদ্ধে জয় পূর্ব্বক বলপূর্ব্বক কন্যাহরণ ও বিবাহ—**রাক্ষস** বিবাহ এবং সুপ্ত বা মত্ত অবস্থায় কন্যাকে হরণপূর্ব্বক তার অসম্মতিতে বিবাহ—**পৈশাচ** বিবাহ। আবার অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহের বিবরণও পাওয়া যায়। উচ্চবর্ণের পুরুষ কর্ত্তৃক তন্নিম্ন বর্ণের কন্যাকে বিবাহ—**অনুলোম** বিবাহ এবং নিম্নবর্ণের পুরুষ কর্ত্তৃক তদূর্দ্ধ্ব বর্ণের কন্যাকে বিবাহ—**প্রতিলোম** বিবাহ। সন্দেহ নেই—ব্রাহ্মবিবাহই সর্ব্বাপেক্ষা সমাদৃত, অন্য বিবাহাবলীর মান তদপেক্ষা ক্রমঃ নিম্নস্তরীয়। আসুর বিবাহ অপত্য বিক্রয়রূপে বহুল নিন্দিত, গান্ধর্ব্ব বিবাহ নারী ও পুরুষের কামাসক্তিবশতঃ, রাক্ষস বিবাহ পীড়নমূলক এবং পৈশাচ বিবাহ ধর্ষণবিশেষ। অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহ শঙ্কর বর্ণের জন্ম দেয়। যে সকল উপায়ে নারী ও পুরুষের ভিতর যৌন সম্বন্ধ ঘটে, শাস্ত্রকারগণ তার প্রত্যেকটির এক একটি যথাপ্রাপ্য সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন মাত্র। কিন্তু সকল বিবাহের সমান স্বীকৃতি নেই এবং

সন্তানদের উত্তরাধিকার সম্বন্ধেও নানা ব্যতিক্রম আছে। প্রকৃত পক্ষে ধর্ম্মার্থ বিবাহই উৎকৃষ্ট, কামার্থ বিবাহ নিকৃষ্ট।

বর্ত্তমান আইনে বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদ

ভারত সরকারের বর্ত্তমান প্রবর্ত্তিত বিবাহ আইনে (১৯৫৫) সবর্ণ, অসবর্ণ, অনুলোম, প্রতিলোমের চুলচেরা বিচারের স্থান নেই —পাত্র-পাত্রী উভয়ে হিন্দু হলেই হলো। পাত্রের বয়স একুশ এবং পাত্রীর বয়স আঠারো পূর্ণ হওয়া চাই। অর্থাৎ, বাল্যবিবাহ নিষেধপূর্ব্বক ইংরাজ আমলে যে আইন প্রবর্ত্তিত হয়েছিল তা বহাল থাকছে এবং অধিকন্তু হিন্দুর একাধিক বিবাহ নিষিদ্ধ হচ্ছে। বর্ত্তমান আইনেও নীতিগত ভাবে সপিণ্ডে বিবাহ বারণ। স্বাভাবিক বিবাহ ক্ষেত্রে হিন্দুর শাস্ত্রীয় মতকে মান্যতা দেওয়া হয়েছে। সপিণ্ড মানে পিতৃপক্ষে সাতপুরুষ এবং মাতৃপক্ষে পাঁচ পুরুষ পর্য্যন্ত জ্ঞাতি। তারপর বাধানিষেধ থাকছে না। নারদ বচনে আছে—"পঞ্চমাৎ সপ্তমাদূর্দ্ধ্বং মাতৃতঃ পিতৃতঃ ক্রমাৎ। সপিণ্ডতা নিবর্ত্তেত সর্ব্ববর্ণেষ্বয়ং বিধিঃ।" বর্ত্তমান আইন সপিণ্ডতার একটা পরিষ্কার তালিকা বেঁধে দিয়েছে এবং তা মানতে হবে। বিচিত্র ভারতবর্ষে অঞ্চলে অঞ্চলে নানা লৌকিক প্রথা ও বিধি বর্ত্তমান। যেমন—সপ্তপদী, মাল্য-বিনিময়, অঙ্গুরীয় বিনিময় ইত্যাদি। এ সকল বিধির মান্যতাও স্বীকৃত হয়েছে হিন্দু বিবাহ আইনে। বিবাহ আইনসিদ্ধ করার জন্য প্রতিটি বিবাহ রেজেষ্ট্রী হওয়া চাই, নচেৎ ভবিষ্য উত্তরাধিকার প্রভৃতি ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দিলে আদালত কোন সাহায্য দিতে পারবে না।

হিন্দুর বিবাহ-বিচ্ছেদ আইন

হিন্দুশাস্ত্রে বিবাহ-বিচ্ছেদ অনুমোদিত নয়। তথাপি পাশ্চাত্যের অনুকরণে এবং বৃটীশের প্রবর্ত্তিত আইনের অনুবৃত্তি অনুসরণে এ জিনিস ভারতে এসেছে। যে যে কারণে বিবাহ-বিচ্ছেদের কথা বলা হয়, তার সবগুলিই অযৌক্তিক, তা নয়। কিন্তু অস্বীকার করার উপায় নেই, এই আইনের অপব্যবহারের পরিব্যাপ্তি অত্যধিক বেড়েই

চলেছে। শত শত বিচ্ছেদের আবেদন জমা পড়ছে আদালতে। আইনজ্ঞদের ব্যাখ্যার কৌশলে সাধারণ সাধারণ কারণগুলিও অসাধারণ গুরুত্ব পেয়ে বিচ্ছেদকে তুলছে অনিবার্য্য ক'রে। আসল ব্যাপার এই যে, বর্ত্তমান ধর্ম্মবিমুখতা তথা চরিত্রনিষ্ঠার অভাবে সমাজের পরিবেশ যথেষ্ট পরিশুদ্ধ নয়। মনোবিকার এক দুষ্ট শত্রু। এখানে নারী-পুরুষ সমান। কালের প্রতিকূল প্রভাবে অল্প কারণেই স্বামী ও স্ত্রীর ভিতরে পারস্পরিক অবিশ্বাস, মতানৈক্য ও অসহিষ্ণুতা দেখা যায়। বিশেষতঃ অধিক বয়সের উচ্চশিক্ষিতা ও আধুনিকা মেয়েদের ভিতরে থাকে স্বাধীন ব্যক্তিত্বের অভিমান এবং পারিবারিক নীতি ও শৃঙ্খলতার প্রতি আনুগত্যের অভাব। তারা মনে করে আমরা কম কিসে। উচ্চ পুঁথিগত শিক্ষা তারা পায়। কিন্তু পায় না মাতৃত্বের শিক্ষা। হিন্দুনারীর চরিত্রবৈশিষ্ট্য হলো আত্মত্যাগ, সেবানিষ্ঠা, গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি, বিনয়, অনুজদের প্রতি বাৎসল্য ও ভালবাসা, অতিথি-অভ্যাগতের প্রতি সৌজন্য ও সমাদর, গৃহকর্ম্মে নৈপুণ্য এবং তজ্জন্য আবশ্যক কষ্টবরণ। এই চারিত্রিক শিক্ষার অভাবেই সহজে মনোমালিন্য দেখা দেয়। দাম্পত্য জীবন হয় ভাঙ্গনের মুখোমুখী। শান্তি কোথা? স্বস্তি কোথা?

হিন্দুর দাম্পত্য জীবনের মাহাত্ম্য

সমাজে আজ ধর্ম্মীয় পরিবেশ নেই। ব্যক্তিজীবনেও ধর্ম্মনিষ্ঠার অভাব। লৌকিক কারণগুলিকেই প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে অধিক। তাই কথায় কথায় বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু হিন্দুর বিবাহবন্ধন কি এতই ঠুন্‌কো জিনিস?

বেদাদি শাস্ত্রপ্রমাণে দেখা যায়—পতি ও পত্নীর সম্পর্ক দৈহিক নয়—আত্মিক। দুটি শুদ্ধ প্রাণের আত্মিক মিলনই বিবাহ। তাই বিবাহ বিচ্ছেদ হবে কি করে? কেনই বা হবে? হিন্দুর বিবাহে আজো কতক প্রসিদ্ধ বেদমন্ত্র উচ্চারিত হয়। বর কন্যার পাণিগ্রহণপূর্ব্বক বলেন—"গৃভ্‌ণামি তে সৌভগত্বায় হস্তম্। ময়া পত্যা জরদষ্টির্যথাসঃ।" (ঋগ্বেদ, ১০।৮৫।৩৬) অর্থাৎ সৌভাগ্যের জন্য আমি তোমার

পাণিগ্রহণ করছি। আমাকে পতিরূপে লাভ ক'রে তুমি বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হও। কন্যা প্রতিজ্ঞা করছেন—"ধ্রুবমসি ধ্রুবাহং পতিকুলে ভূয়াসম্।" আমি ধ্রুব নক্ষত্র দর্শন করলাম, পতিকুলে ধ্রুব তারার ন্যায় অচলা থাকবো। বর ও কন্যার মিলিত প্রার্থনা—"সমংজংতু বিশ্বে দেবাঃ সমাপো হৃদয়ানি নৌ। সং মাতরিশ্বা সং ধাতা সমুদেষ্ট্রী দধাতু নৌ।।" (ঋগ্বেদ, ১০।৮৫।৪৭) বিশ্বদেবগণ ও জলদেবতাগণ আমাদের উভয়ের হৃদয়কে পরস্পর মিলিত করুন। মাতরিশ্বা, ধাতা এবং বাগ্দেবী আমাদের উভয়কে পরস্পর মিলিত ক'রে দিন। আবার "মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধামি। মম চিত্তমনুচিত্তং তে অস্তু।। মম বাচমেকমনা জুষস্ব। প্রজাপতিষ্ট্বা নিযুনক্তু মহ্যম্" (পারস্কর সূত্র) বর কন্যার বুকে করস্পর্শপূর্ব্বক বলেন—আমার ব্রতে তোমার হৃদয়কে স্থাপন করছি, আমার চিত্তের অনুকূল তোমার চিত্ত হোক, আমার বাক্যের অনুরূপ তোমার বাক্য হোক, প্রজাপতি তোমাকে আমার প্রতি নিযুক্ত করুন। পত্নীর প্রতি কি সম্মান! "সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব সম্রাজ্ঞী শ্বশ্রাং ভব। ননান্দরি সম্রাজ্ঞী ভব সম্রাজ্ঞী অধি দেবৃষু।" (ঋক্ ১০।৮৫।৪৬) কি সুন্দর মন্ত্র! তোমাকে আমি সংসারের সম্রাজ্ঞীরূপে গ্রহণ করছি। তুমি শ্বশুরের উপরে সম্রাজ্ঞী হও, শাশুড়ীর উপরে সম্রাজ্ঞী হও, ননদিনীদের উপরে সম্রাজ্ঞী হও, দেবরদের উপরে সম্রাজ্ঞী হও। এ আদর্শ পৃথিবীর আর কোথাও কি আছে? এ জিনিস পায়ের তলায় পিষে হিন্দুদম্পতী ছুটছে বিচ্ছেদের পিছনে। কি দুর্ভাগ্য!

বিচ্ছেদ কি কোন স্থায়ী সমাধান?

সংসার জীবনে কখনো কখনো অল্প-বিস্তর মতভেদ হতেই পারে। তার জন্যই কি ধুন্দুমার কাণ্ড ঘটিয়ে বিচ্ছেদের পথে যেতে হবে? বিচ্ছেদের পর পুনঃ অন্য পতি বা পত্নী গ্রহণ করলে সেখানেও যে মতানৈক্য হবে না তার কোন নিশ্চয়তা আছে কি? একবার পাশ্চাত্য দেশের পরিসংখ্যান সন্ধান করে দেখুন, প্রথম বিবাহের পর শতকরা কত সংখ্যক বিচ্ছেদ হয়। আবার একবার

বিচ্ছেদের পর সারা জীবনে কতবার বিচ্ছেদ ঘটে। সাম্রাজ্যবাদী দেশের রাজপরিবারেও দেখি আপসহীন ভাঙ্গন। পতি-পত্নীর ভিতরকার divine relation কি তবে প্রহসনের বস্তু? সুতরাং, বিচ্ছেদ কোন স্থায়ী সমাধান নয়। স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই থাকা উচিত মানিয়ে চলার মানসিকতা। চাই ধৈর্য্য, চাই সহিষ্ণুতা, চাই ত্যাগ, চাই অকপট প্রণয় ও ভালবাসা, চাই সুখে দুঃখে, আধিতে ব্যাধিতে, দারিদ্র্যে সম্পদে পরস্পরকে সেবা ও সহযোগিতা করা। স্বামী-স্ত্রীতে বিচ্ছেদের কথা স্বামী প্রণবানন্দ ভাবতেই পারেন না। আমরা প্রত্যক্ষ করেছি তিনি অনেক দম্পতীর মনোমালিন্য মিটিয়ে দিয়ে তাদিগকে ফিরিয়ে এনেছেন সুস্থ জীবনে। নারী জাতির প্রতি তাঁর উপদেশ —"দেখ মা, স্বামী স্ত্রীলোকের গুরু। তাঁর সুখে সুখ দুঃখে দুঃখ অনুভব করতে হয়। স্বামী যেমনই হোক (স্বল্প উপায়ী বা এরূপ কিছু) তাঁকে শ্রদ্ধা, ভক্তি, সেবা করতে হয়। তিনি অসন্তুষ্ট হলে সমস্ত কার্য্যই নিষ্ফল।" আবার বলেছেন—"স্বামীর মৃত্যু হলেও তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধ ত্যাগ হয় না। নিজে খেলে মনে করতে হয় তিনিও খেয়েছেন। চলা ফিরা সমস্ত কাজকর্ম্মে তাঁকে মনে করতে হয়। স্বামী ইহকাল, পরকাল। সব সময়েই স্ত্রীর সঙ্গে আছেন। তিনি মৃত্যুর পরও থাকেন।"হিন্দুর শাস্ত্রাদিতে এই পাতিব্রত্য ধর্ম্মেরই প্রশংসা কীর্ত্তন। হিন্দুর সংসার-জীবনে যুগ যুগ ধরে শান্তি, প্রীতি, কল্যাণ বিরাজিত আছে নারীর সেবা, ধর্ম্মশীলতা, ধৈর্য্য, আত্মত্যাগ, বাৎসল্য, পাতিব্রতের উপরই। এ আদর্শ থেকে সরে গেলে সংসারে আগুন তো জ্বলবেই। কোন সরকারী আইনই সেই আগুন নিভাতে পারবে না।

বিশেষ বিবাহ আইন

এই আইনের জন্ম ইং ১৯৫৪ সালে। এই আইনে কোন ধর্ম্মাধর্ম্মের বালাই নেই, জাতি-গোত্রের বাধা নিষেধ নেই, সপিণ্ডতার বন্ধন নেই, নেই কোন ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠানের আড়ম্বরও। দুই ভিন্নধর্ম্মী পাত্র ও পাত্রীকেও নিজ নিজ ধর্ম্ম পালনের স্বাধীনতা দিয়ে দাম্পত্য

জীবন সিদ্ধ করা যায়। পাত্র ও পাত্রী তিন জন সাক্ষী নিয়ে নির্দ্ধারিত কালনিয়ম মেনে ম্যারেজ রেজিষ্টারের অফিসে যাবে, প্রয়োজনীয় খাতা-পত্রে সহি-স্বাক্ষর করবে এবং এক শপথ বাক্যে উভয়ে উভয়কে আইনসম্মত পত্নী বা পতিরূপে স্বীকারোক্তি দিবে। হয়ে যাবে বিবাহ। ম্যারেজ রেজিষ্টার বিবাহ সিদ্ধ ঘোষণা করবেন এবং একটি সার্টিফিকেট দিবেন। বলা বাহুল্য, এই বিবাহ নিছক যৌনাসক্তি ব্যতীত আর কিছুই নয়। বিচ্ছেদের ধারাগুলিও একই রকম।

জন্মশাসনের দাপট

জনসংখ্যা স্ফীতি রোধে নরহত্যার তুল্য ভ্রূণহত্যা বর্ত্তমানে আইনসিদ্ধ। আর জন্মশাসনের তাগিদে আবিষ্কৃত হয়েছে অনেকবিধ কৃত্রিম উপায়। তন্মধ্যে অস্ত্রোপচার দ্বারা পুরুষ বা নারীকে নাশবন্দী করা অন্যতম। প্রচার করা হয়—ছোট পরিবার, সুখী পরিবার। ধরে নেওয়া যাক্—বর্ত্তমানে ধরিত্রী লোকভারাক্রান্তা। তাই দেশে দেশে রাশি রাশি সঞ্চিত আণবিক অস্ত্রের দ্বারা বিরাট লোকক্ষয়ের জন্য অপেক্ষা না ক'রে এখনই নানা কৃত্রিম পদ্ধতিতে জন্মহার কমাতে হবে। কিন্তু সমাজ-কল্যাণের আর একটা বিশেষ দিকও তো বিচার্য্য। শ্রীরামকৃষ্ণ তৃতীয় গর্ভের সন্তান, স্বামী প্রণবানন্দ পঞ্চম গর্ভের, কবি রবীন্দ্রনাথ জননীর চতুর্দ্দশ সন্তানের ভিতরে অষ্টম কনিষ্ঠ পুত্র। এই রকম সহস্র সহস্র দৃষ্টান্ত তুলে ধরা যায়। যদি দু'একটি সন্তানের জন্মের পর নাশবন্দীর আশ্রয় নেওয়া হয় তবে এই রকম হাজার হাজার মহাপুরুষ ও প্রতিভাধর সন্তানের আবির্ভাবের পথ কি বন্ধ হয়ে যাবে না? আধুনিক কালে সহধর্ম্মিণী চায় কয়জন? সকলেই চায় সহকামিনী। ভোগ চলবে যথেচ্ছ, কিন্তু সন্তান হবে না। এই উপায়েই নাকি সংসারে আসবে সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য। কিন্তু এখানেই কি নাটক শেষ? নাশবন্দীর মুক্ত জীবন কি সম্পূর্ণ প্রতিক্রিয়াবর্জ্জিত? মনস্তাত্ত্বিক সমীক্ষায় কি দেখা যায় নি যে, এই মুক্ত জীবনে স্বামী-স্ত্রীর ভিতরে পরস্পর মানসিক সন্দেহ ও অবিশ্বাস দানা বেঁধে উঠবার যথেষ্ট সুযোগ থেকে যায়? দম্পতীর পারস্পরিক অকপট

প্রেম, প্রীতি, শান্তি, সহযোগিতা ও সমমর্ম্মিতার ক্ষেত্রেও ধরে ভাঙ্গন। এর পর যদি বিচ্ছেদই ঘটে যায়, তাহলে আর আশ্চর্য্য কি?

জন্মশাসনের ভদ্রোচিত মার্গ

জন্মশাসনের কি কোন বিকল্প ভদ্রোচিত উপায় কিছু নেই? দু'তিনটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর দাম্পত্য জীবনে আত্মসংযমের পথটা খারাপ কি? বরং এ পথেই স্বাস্থ্য, শুচিতা, শান্তি ও যথার্থ সুখ। ইন্দ্রিয়সম্ভোগের লালসা কি বার্দ্ধক্যেও নিবৃত্ত হয়? লালসা যে আগুন, যত ইন্ধন দিবে জ্বলবে তত হু হু ক'রে। মহাভারতের বাণী।

যৎ পৃথিব্যাং ব্রীহিযবং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ।
একস্যাপি ন পর্য্যাপ্তং তস্মাৎ তৃষ্ণাং পরিত্যজেৎ।।

এই পৃথিবীতে যত ধান্য, যব, স্বর্ণ, পশুসম্পৎ ও ভোগ্যা নারী আছে তা একজনের ভোগলালসা নিবৃত্তির পক্ষেও যথেষ্ট নয়। সুতরাং, এক জায়গায় থামতে হবেই। মানুষ তো আর ইতর পশু নয়। স্বামী প্রণবানন্দ ভারতের এই সনাতন উপায়েরই পথনির্দ্দেষ্টা। এক নবদীক্ষিতা শিষ্যাকে প্রশ্ন করেন—"মা, তোমার কয়টি সন্তান? ছোট সন্তানের বয়স কত?" শিষ্যার উত্তর—"বাবা, আমার চারিটি সন্তান, ছোট ছেলেটির বয়স দেড় মাস।" শ্রীগুরুর উক্তি—"চারিটি সন্তানই তো যথেষ্ট, আর দরকার কি?" অর্থাৎ, তাঁর অভিপ্রায় এই দম্পতী এখানেই থামুক, পরস্পর ভাই-ভগিনীরূপে সংসার করুক। কিন্তু বর্ত্তমান ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতার যুগে মানুষের বধির কর্ণে এই কল্যাণবাণী মধুক্ষরণ করবে কি?

আমরা শীঘ্রই গ্রন্থের উপসংহার পর্ব্বে আসছি। বিগত আট শতাব্দীর হিন্দুর সমাজ-বিবর্ত্তনের ইতিহাসে অনেক অমীমাংসিত প্রশ্নের পাহাড়ই জমা হয়ে আছে। পর্য্যালোচনা ক'রে দেখলেই বুঝতে পারি—এই ভারতের তথা এই বঙ্গের সমাজ-বিবর্ত্তনের ধারায় কখনো এসেছে আলো, কখনো আধো আলো, কখনো বা অন্ধকার। অনির্ব্বাণ আলো কোথায়?

একাদশ অধ্যায়

স্বামী প্রণবানন্দের আবির্ভাব : সমাধান

নিরাশার সান্দ্র তমসায় অবশেষে জ্বলে আশার আলো। পাওয়া যায় সমস্যা-সমাধানের অভ্রান্ত পথ। পশ্চাতে দীর্ঘ কয়েক শতাব্দীর সমাজ-বিবর্ত্তনের বহু অমীমাংসিত প্রশ্নের খতিয়ান, আর সম্মুখে স্বল্পপরিসর মহাজীবনে বহুমুখী কর্ত্তব্যসাধন—এই পটভূমিতেই আবির্ভাব ঘটে যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দের। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের পুণ্যা মাঘী পূর্ণিমা তিথিতে বর্ত্তমান বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলায় (বর্ত্তমানে মাদারীপুর জেলা) বাজিতপুর গ্রামে গোধূলি লগ্নে তদীয় শুভ জন্ম। কে তিনি? কেন তাঁর আবির্ভাব? সিদ্ধ মহাযোগী হয়েও সমাধির অতল গহ্বর থেকে কেন তিনি নেমে এলেন মানুষের কাছে? একদিন (১৯২৩; খুলনা) এই সংশয় জেগেছিল প্রথিতযশাঃ মহাপুরুষ মহামণ্ডলেশ্বর শ্রীমৎ ভোলানন্দজী গিরি মহারাজের অন্তরে। উত্তরে সেদিনকার তরুণ যোগী বলেছিলেন তাঁর অমিত যোগশক্তির কথা—আর বলেছিলেন কেন তিনি হরিদ্বার-ঋষিকেশে সমাধিমগ্ন না থেকে আর্ত্ত মানবতার আত্মিক কল্যাণে গড়েছেন মহাসঙ্ঘ—ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ—"আমি এসেছি সহস্রগুণ শক্তি নিয়ে, আমি এসেছি একটা Shape দিতে, সহস্র সহস্র মানুষকে গঠন করতে।" অর্থাৎ, তিনি সম্প্রদায়সর্ব্বস্ব কোন রক্ষণশীল যোগী নন—তিনি প্রগতিশীল মানবসেবাব্রতী। এ যুগের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় সমস্যার সমাধানের আলোকবর্ত্তিকা হাতে নিয়েই এই যুগন্ধর পুরুষের কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ। ঘোষণা করেন—"আমার আন্দোলনই শেষ আন্দোলন।"

আমি এসেছি সহস্র গুণ শক্তি নিয়ে—একটা shape দিতে

কত আন্দোলনের পর আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গ উঠেছে এই মাটির বুকে। কিন্তু শেষ কোথা? তদীয় জন্মলগ্নেও কি যুগযন্ত্রণার

কোন অবধি ছিল? দেশ চলছিল এক বহুবিপর্য্যস্ত গভীর ক্রান্তির ভিতর দিয়ে। ৭১১ খৃষ্টাব্দে ভারতের মাটিতে ইসলামের প্রথম পদক্ষেপের দিন থেকে হিন্দুদের দুর্ভাগ্যে যে ব্যাপক যাবনিক সংশ্রব ঘটেছিল, তার অবসান তো হয়ই নি, তদুপরি রাজ্যাধিকার ইংরাজের হাতে অন্তরিত হওয়ায় ধনবান ও সুসংগঠিত খৃষ্টান মিশনারীদের ধর্ম্মান্তর কর্ম্ম ব্যাপকতর রূপে প্রকট। স্বামী বিবেকানন্দের সময়ে এই বিপর্য্যয়ের সবে শুরু, আর স্বামী প্রণবানন্দের কার্য্যকালে তা ষোল কলায় পূর্ণ। এই নূতন যাবনিক সংশ্রবও সমাজ-হিতচিকীর্ষু ব্যক্তিগণের শিরঃপীড়ার কারণ হয়। কে লড়বে এই অপশক্তির সঙ্গে?

বিংশ শতাব্দীর সমস্যার ব্যাপকতা

আবার পাশ্চাত্য ইংরাজী শিক্ষার অবগুণ এই কালে ঊনবিংশ শতাব্দীর সীমাকেও ছাড়িয়ে যায়। এ দেশের যুবাদের মগজ ধোলাইয়ের কাজটি তখন তুঙ্গে। তারা বিলাসপ্রবণ, সংযম-ব্রহ্মচর্য্যহীন, নৈতিক অধঃপতনের বলি। পাশ্চাত্যপ্রেমী বাবুরা স্বধর্ম্ম ও স্বসমাজ সম্বন্ধে অচেতন, উদাসীন, এমন কি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসহীন। সহস্র বৎসর যবনের গোলামির অবশ্যম্ভাবী পরিণামে আর্য্যহিন্দু আত্মবিস্মৃত, আত্মপ্রত্যয়হীন, হীনমন্য, পরানুকরণপ্রিয়। কয়েক শত বৎসরের প্রতিক্রিয়াশীল সংস্কার আন্দোলনগুলি হিন্দুকে ঐক্যবদ্ধ করতে তো পারেই নি, বরং পারস্পরিক ঈর্ষ্যা, দ্বেষ, ঘৃণা, বৈষম্য ও বিভেদকে ইন্ধনযোগে আরো অগ্নিময় ক'রেই তুলেছে। ফলে বিরাট হিন্দুসমাজ সহস্রধা ছিন্নভিন্ন—দুর্ব্বল, বিরুদ্ধশক্তির সহিত সংগ্রামে পরাভূত এবং পলায়নপর। দেশে দারিদ্র্য আছে, বেকারী আছে, আর আছে কুসংস্কারের আকাশছোঁয়া পাহাড়। মুসলমান এবং খৃষ্টান যখন স্বধর্ম্মাশ্রয়ী বীর্য্যে উদ্দীপ্ত, হিন্দু তখন ভুলতে বসেছে জাতীয় জীবনের প্রাণপ্রদায়িনী স্বধর্ম্মনিষ্ঠাকেও। পূজা-পার্ব্বণ, মহোৎসব, মেলার বহুল অনুষ্ঠান হয়, কিন্তু তা একান্তই গতানুগতিক। হিন্দুরা ধর্ম্মের অন্তরঙ্গ সাধন বিস্মৃত—কেবল বাহ্যাচারে কৃতকৃতার্থ।

শুধু কি যুবসমাজের অবক্ষয়, হিন্দুর গার্হস্থ্য জীবনেও কই

সেই ত্যাগ, সেবা, সংযম, সদাচার? দাম্পত্য জীবনে কেবল পশুর ন্যায় যৌনসম্ভোগ। একান্নবর্ত্তী পরিবার ভাঙ্গনের মুখে। সমাজে অবহেলিতদের দুঃখ-দুর্দ্দশা অবর্ণনীয়। তাদিগকে খেপিয়ে দেবার নেতা আছে, ভালবাসার বান্ধব নেই। পূর্ব্ব প্রবন্ধে বর্ণিত বিংশ শতাব্দীর খণ্ড সংস্কার আন্দোলনগুলি নিপীড়িতদের নিদ্রাভঙ্গে রসদ যুগিয়েছে ঠিক, কিন্তু এই জাগরণকে সঠিক পথে পরিচালনের নেতার অভাব ছিল। ফলে তা চালিত হয় বিপথে এবং বিধর্ম্মীরা চেষ্টা করে বিদ্রোহীদিগকে স্বদলে টেনে আপন শক্তি বাড়িয়ে তুলতে। এই সময়ে জাতীয় কংগ্রেসের ভূমিকা তোষণমুখী। ফলে হিন্দুত্বের অভ্যুত্থান প্রতিকূল হয়ে দাঁড়ায়। আর সংখ্যালঘুদের স্পর্দ্ধাজনিত শক্তি হিংসাশ্রিত পথে পৃথক্ রাষ্ট্র আদায়ে সুসংগঠিত হয়ে উঠে। এই অরাতিসুলভ অপশক্তি প্রতিহত হবে কি উপায়ে?

আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা পূর্ব্বেই দেখেছি, জীমূতবাহন, শূলপাণি, স্মার্ত্ত রঘুনন্দন থেকে আরম্ভ ক'রে দেবীবর ঘটক, রাজা রামমোহন রায়, দয়ানন্দ সরস্বতী পর্য্যন্ত যুগে যুগে যে সকল সংস্কার প্রচেষ্টার উদ্ভব, প্রকৃতিগত ভাবে তৎসমুদয় অধিকাংশই তাৎক্ষণিক জোড়াতালি চিকিৎসা। তাতে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া দু-ই দেখা গিয়েছে। এ প্রসঙ্গে বল্লাল সেনের কৌলীন্যপ্রথা, রঘুনন্দন কর্ত্তৃক বর্ণাশ্রমের মূল কাঠামো থেকে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতির বিলোপ সাধন, দেবীবর ঘটকের মেলবন্ধ, ব্রাহ্মসমাজের খিচুড়ি ধর্ম্মমত, আর্য্যসমাজের 'হিন্দু' নাম বর্জ্জন—প্রভৃতির ফলাফলের কথা আমরা পুনরায় স্মরণ করতে পারি। সন্দেহ নেই যুগের তাৎক্ষণিক ব্যাধির নিরাময়ের জন্য তাৎক্ষণিক চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য্য। কিন্তু একটি স্বাস্থ্যবান ও বীর্য্যবান মানুষের জন্ম দিতে হলে শুধু ব্যাধির তাৎক্ষণিক লক্ষণের উপশমের দ্বারা তা সম্ভব হয় কি? চাই—ব্যাধিতের শরীরে পর্য্যাপ্ত জীবনীশক্তির সঞ্চার। ইংরাজীতে একেই বলা হয় Vital force. ইহাই রোগের মূলের চিকিৎসা। যুগ যুগ ধরে এ কাজটিই হয়েছে অবহেলিত।

উপসর্গের চিকিৎসা স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়, চাই সমাজ-ব্যাধির মূল চিকিৎসা

সঙ্ঘপ্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রণবানন্দ আপন তপোলব্ধ ঐশী প্রজ্ঞাবলে এই বাস্তব সত্যের মর্ম্মোদ্ঘাটক। আর এই সত্যের ভিত্তিতেই গড়ে তুলেছিলেন তদীয় সংস্কার ও সংগঠন আন্দোলনের প্রকল্পগুলি।

অবশ্য কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে আচার্য্যকে বহু তাৎক্ষণিক কর্ত্তব্যও পালন করতে হয়। অপহৃতা ও ধর্ষিতা নারীর উদ্ধারসাধন, ধর্ম্মান্তরিতদের শুদ্ধিপূর্ব্বক সমাজে পুনর্বাসন, অস্পৃশ্যতা ও অনাচরণীয়তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম, ধর্ম্মীয় তীর্থস্থানসমূহের পরিশোধন, বন্যা-দুর্ভিক্ষ, ভূকম্প, অনাবৃষ্টি ও অন্যবিধ দুর্দ্দৈবে বিপন্ন ও আর্ত্ত মানবতার সেবা, হিন্দুর পূজা-পার্ব্বণ সমুদয়ের যথা তাৎপর্য্য ব্যাখ্যাপূর্ব্বক ঐগুলিকে জাতীয় কল্যাণ ও জাতীয় সংহতি সাধনের রূপদান, অর্থহীন আচার-বিচারের অসারতা প্রতিপাদন ও শাস্ত্রবিহিত সদাচারের প্রতিষ্ঠা, ভারতীয় ঋষি-ধারায় মানুষ গঠনমূলক আদর্শ শিক্ষার বিস্তার, উত্তমর্ণদের আগ্রাসন থেকে সর্ব্বহারা কৃষকগণকে রক্ষাকল্পে সাময়িক কৃষি-ঋণ প্রদান, বস্ত্রবয়নাদি কুটীর শিল্পের প্রবর্ত্তন, ভারতের অর্থবান, কিন্তু রক্ষণশীল সাধুসন্ত ও মোহন্ত-মণ্ডলেশ্বরগণকে হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজ রক্ষায় আত্মনিয়োগের আহ্বান, অনুন্নত ও উপজাতীয়গণের কল্যাণে যথোচিত কর্ম্মপ্রচেষ্টা, দরিদ্র রোগীদের জন্য দাতব্য চিকিৎসালয় পরিচালন—এ রকম আরো অনেকবিধ কর্ম্মযোজনা স্বামী প্রণবানন্দের যুগলীলায় আমরা প্রত্যক্ষ করি। আপন সীমিত জনবল ও অর্থবল নিয়োগ-পূর্ব্বক তিনি সমাজের আশু কল্যাণের বহুমুখী কর্ম্মযজ্ঞে আপনাকে উৎসর্গ করেছিলেন।

সামসময়িক সমস্যা নিরসনে স্বামী প্রণবানন্দ

কিন্তু এখানেই তিনি থেমে থাকেন নি। তদীয় 'মিশন' ছিল বিশ্বগ্রাসী—মহাজাগরণ, মহামিলন, মহাসমন্বয় ও মহামুক্তির লক্ষ্যে সমগ্র মানবনিবহকে প্রবুদ্ধ করতেই আচার্য্য প্রণবানন্দের দিব্য জন্ম ও দিব্য কর্ম্ম। বিশেষতঃ হিন্দু-সমাজের নবরূপকার এই সন্ন্যাসী চেয়েছেন আমূল সংস্কার। ঐ যে বজ্রকণ্ঠের ঘোষণা—"আমার আন্দোলনই

আমূল সংস্কারে কর্ম্মপ্রকল্প

শেষ আন্দোলন", তার তাৎপর্য্য কি? যে সকল আধ্যাত্মিক, নৈতিক, ধার্ম্মিক ও সামাজিক সমস্যা দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত অমীমাংসিত, তিনি তার শেষ সমাধান দিতে উৎসুক।

মরা নদীর স্রোত ক্ষীণ, তার গর্ত্তে গর্ত্তে গলিত আবর্জ্জনা। কিন্তু কেউ কি পেরেছে সেই পূতিগন্ধময় আবর্জ্জনারাশিকে ক্ষুদ্র খনিত্রে নির্ম্মূল করতে? অশ্রান্ত শ্রাবণী বর্ষার প্রচণ্ড প্লাবনে সেই মরা গাঙে যখন বান ডাকে তখন সেই খরস্রোতে কোথায় ভেসে যায় সকল পূঞ্জীভূত জঞ্জাল। সমাজ-সংস্কার ও জাতিগঠনের ক্ষেত্রেও এই দৃষ্টান্ত। সনাতন ভারতবর্ষের এই ধারা। এ দেশের নেতা, পাতা কোন রাজা, মন্ত্রী, ধনী, মহাজন বা বুদ্ধিজীবী নহেন —সত্যদ্রষ্টা ঋষি, মহর্ষি, অবতার পুরুষগণই ভারতের স্রষ্টা, পাতা, পরিত্রাতা। যুগে যুগে মর্ত্ত্যের ধূলিতে তাঁদের মহাবির্ভাব। তাঁদের আবির্ভাব আধ্যাত্মিক মহাশক্তি ও মহাভাবের বিশ্বপ্লাবী স্রোতোধারার নব ভগীরথ রূপে। আমূল সংস্কারের তাঁরাই যোগ্য পুরোধা। স্বামী প্রণবানন্দ এই চরিত্রেরই মহাভাগবত পুরুষ। আমূল সংস্কারের অভ্রান্ত ঋক্ ঐ পূর্ব্বোক্ত যুগঘোষণা—"আমার আন্দোলনই শেষ আন্দোলন।"

বস্তুতঃ স্বামী প্রণবানন্দের ভাগবত মানসে যুগব্যাধির প্রকৃত কারণ ধরা পড়ে। কালক্ষেপ না ক'রে সর্ব্বশক্তি নিয়োজনে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েন কর্ম্মক্ষেত্রে। সমাজের আবল্যের জন্য তিনি কাউকে দোষারোপ করেন নি, কেবল মানুষে মানুষে দোষ খুঁজে বেড়ান নি, কাউকে আঘাত দেন নি, কোন বিশেষ শ্রেণীকে গালিবর্ষণ করেন নি, কারুর বিরুদ্ধে কাউকে লেলিয়ে দেন নি, তিনি এমন কিছু করেন নি যা সমাজে নূতন বিতর্ক সৃষ্টিপূর্ব্বক পরিবেশকে তুলবে তাতিয়ে। তদীয় আন্দোলন সম্পূর্ণ অবিরোধী—মহাসমন্বয়ই মুখ্য উপজীব্য। তিনি বেছে নেন সেবার পথ, ভালবাসার পথ। স্পষ্ট ঘোষণা—"আমরা চাই সংস্কার, মিলন, সংগঠন। কিন্তু আমরা এমন কিছু করবো না, যাতে সমাজে বিপ্লব (প্রতিক্রিয়া) আসতে

প্রণবানন্দের সংস্কার আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য

পারে, অথবা আদর্শের বিপর্য্যয় ঘটতে পারে। এই ভিন্ন-ভিন্ন হিন্দুজাতি সম্মিলিত, সবল, সুস্থ, সতেজ, সজাগ, শক্তিমান হয়ে যাতে নিজের আদর্শের পথে, লক্ষ্যের পথে চলতে পারে, আমরা তেমন সেবাই করবো।"

উপর্য্যুক্ত ঘোষণার ভিতরেই স্বামী প্রণবানন্দের সংস্কার আন্দোলনের মূল প্রকৃতিটি ধরা পড়ে। ধার্ম্মিক ও আধ্যাত্মিক গুরুপদে অধিষ্ঠিত হয়েও তিনি কোন স্বতন্ত্র সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর জন্মদাতা নন—কোন নূতন জটিল দার্শনিক মতবাদের প্রবক্তাও নন। তিনি এগিয়ে চলেছেন সনাতন বৈদিক ধারাকে পরমানুগত্যে নিরন্তর অনুসরণ পূর্ব্বক। এই জন্যই তিনি অকুণ্ঠ কণ্ঠে সর্ব্ব সম্প্রদায়ের হিন্দুকে জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে ডাক দিতে পেরেছেন। এক সাধারণ হিন্দুত্বের সর্ব্বোদার আদর্শ সম্মুখে রেখে তিনি বলতে পেরেছেন—"আমি হিন্দুকে হিন্দু নামে ডাক দিতে চাই। যার যা নাম সেই নামে ডাক দিলেই সে সাড়া দেয়।" তাই বৈষ্ণব নয়, শাক্ত নয়, শৈব নয়, ব্রাহ্মণ নয়, শূদ্র নয়, ব্রাহ্ম নয়, আর্য্যও নয়—সকলেরই এক সাধারণ পরিচয়—হিন্দু। স্বামী প্রণবানন্দ ভাঙ্গতে আসেন নি, এসেছেন গড়তে। চাই সংস্কার—সংহার নয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর সংস্কার আন্দোলনাবলীর ভিতরে যে দৈন্য, ভ্রান্তি ও বিভেদের প্রচ্ছন্ন বীজ আমরা দেখেছি, তা পরিমার্জ্জিত হয় স্বামী প্রণবানন্দের কর্ম্মবৈচিত্র্যের স্তরে স্তরে। তা বলে কোন প্রতিষ্ঠানের নিন্দা বা সমালোচনাকারী তিনি নহেন। বরং উক্ত সংস্থাবলীর প্রবর্ত্তিত আন্দোলনের বিশুদ্ধ ও নির্ব্বিরোধ উপকরণগুলি সাদরে গ্রহণ পূর্ব্বক আপন কর্ম্মধারাকে করেছেন অধিকতর প্রগতিশীল ও সর্ব্বজনগ্রাহ্য।

আভিধানিক অর্থে স্বামী প্রণবানন্দ কিন্তু কোনো স্মৃতিকার নহেন, কোন হাতুড়ে সমাজ-সংস্কারকও নন। তিনি প্রবর্ত্তন করেন প্রবল ধর্ম্মীয় ও আধ্যাত্মিক আন্দোলনের। তা করতে গিয়ে সমাজক্ষেত্রে যে সকল প্রতিবন্ধকতা সম্মুখে পড়েছে তার নিরসন তাঁকে করতে হয়েছে। কারণ, এ যুগের মানুষ নিছক ধর্ম্মকথা

শুনতে চায় না। তারা শুনতে চায় দেশ, জাতি ও সমাজের কথা। ধর্ম্ম যদি মানুষের এই সকল নির্ম্মম বাস্তব সমস্যার সমাধান দিতে না পারে তবে সেই বন্ধ্যা ধর্ম্ম কে চায়? স্বামী প্রণবানন্দ সঠিক পথেরই আবিষ্কারক। তিনি আত্মনিয়োগ করেন ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিকতার ভিত্তিতে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও জাতিগঠনে। তাই অত্যল্প কালের ভিতরেই তৎপ্রবর্ত্তিত আন্দোলন জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করে।

প্রণবানন্দের আন্দোলন ধর্ম্মভিত্তিক

আচার্য্যের স্বানুভবদৃপ্ত অভিমত—"এ দেশ চিরকাল ভগবানকে লইয়াই চলিতেছে এবং চলিতে চায়। জড়বাদকেই যে দেশ চরমবাদ বলিয়া ধরিয়াছে, এ দেশ সে দেশ নয়। এ দেশ চায় নীতি, ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিকতা।" আবার বলেন—"ভারতবর্ষের-হিন্দুজাতির প্রকৃতিই এমনি যে, ধর্ম্মকে ভিত্তি ক'রে ছাড়া যথার্থ সমষ্টি জীবন গঠন অসম্ভব। কংগ্রেস রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তিতে ভারতীয় সমষ্টি-জীবন গড়ে তুলতে চায়, আমরা ধর্ম্মকে ভিত্তি ক'রে জতিগঠন করতে চাই।" এ কথা আজ আর অস্পষ্ট নয় যে, কংগ্রেসের রাজনৈতিক সংগ্রামে ভারতে যে খণ্ডিত স্বাধীনতা লাভ হয়েছে, তা মুখ্যতঃ ভৌগোলিক। কিন্তু ভারতের আত্মিক স্বাধীনতা লাভ হলো কৈ? সমষ্টি জীবন গড়ে উঠবে কার ভিত্তিতে? ধর্ম্মনিরপেক্ষতা-বাদ ভারতে অখণ্ড জাতীয় সংহতি আনতে পারে নি, বরং রাজনৈতিক কোলাহল ও ক্ষমতা লাভের লড়াই দেশের ঐক্য ও সম্প্রীতিকে অধিকতর বিপন্ন ক'রেই তুলেছে। কলঙ্কিত বিভেদ ও দুর্নীতি শুধু নীচের তলায়ই নয়—উপরের তলায়ও। এ দৃশ্য বিশ্বের সর্ব্বত্র। ভোগবাদী পাশ্চাত্য দেশগুলি ধর্ম্ম ও সমাজ এতদুভয়ের মধ্যে দুর্ল্লঙ্ঘ্য প্রাচীর তৈরী ক'রে আজ ভয়ঙ্কর প্রতিকূলের সম্মুখীন। ব্যক্তিজীবন উচ্ছৃঙ্খল, পারিবারিক জীবন ভেঙ্গে খান্ খান্, দাম্পত্য জীবনে নিত্য বিচ্ছেদ। পানীয়ের নেশা এবং অবাধ যৌনাচারের বীভৎসতা গ্রাস করেছে সেই সব দেশকে। এড্‌স্ এর ন্যায় দুরারোগ্য যৌন ব্যাধির সংক্রমণে সেই সব দেশের প্রতিটি নাগরিক আজ

এ দেশ চায়-নীতি, ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিকতা

ভীত, সন্ত্রস্ত। ধর্ম্মকে নির্ব্বাসন দিয়ে কোন্ দেশের মানুষ কবে সুখী হয়েছে? ধর্ম্ম ব্যতীত সমাজের শৃঙ্খলা ও সুস্থিতি কি সম্ভব? অখণ্ড ঐক্য কি আসতে পারে?

মূল আলোচ্য বিষয়ের ভূমিকা স্বরূপ আরও একটি বিষয় উল্লেখ করা ভাল। স্বামী প্রণবানন্দ ধর্ম্মীয় নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে যে সমাজের আমূল সংস্কার চেয়েছেন, সেই ধর্ম্মের মূল প্রতিপাদ্য কি, যা ঐক্য সাধনায় অনুকূল? সে ধর্ম্ম কি কোন বিশিষ্ট মতবাদ? অথবা, কোন নূতন দার্শনিক তত্ত্বের চমৎকারিত্ব? মতবাদের ধর্ম্ম দিয়ে বহু শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত হিন্দু-সমাজকে যে ঐক্যবদ্ধ করা যায় না, তার পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন। যদি কেউ বলেন তাঁর উপাস্য কৃষ্ণ, শিব বা শক্তিই একমাত্র আরাধ্য বা আরাধ্যা তবে সেই মতবাদে আসমুদ্র হিমাচল ভারতের হিন্দু সাড়া দিবে কি? এতে তো সমাজ ভাঙ্গে, গড়ে না। আবার দার্শনিক মতবাদগুলিও চরিত্রগত ভাবে পরস্পর বিভিন্ন। এদেশে দার্শনিক বিতর্কের বাক্-বৈখরী অন্তহীন। একে অন্যের মতবাদ খণ্ডনের কাদা ছোঁড়া-ছুঁড়ি কি কম হয়েছে? তাতে দলাদলিই বেড়েছে, তৈরী হয় নি ঐক্যের ভূমি। স্বামী প্রণবানন্দ তাই ও-পথ মাড়ান নি। তিনি সহজ সত্যের উপাসক। এই সহজ সত্য বিতর্কলভ্য নয়—সাধন-সাপেক্ষ। ত্যাগ, সংযম, সত্য, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রয়ী হয়ে তবে এই সাধন কর্ত্তব্য। ভক্ত ও শিষ্যদের মনোরঞ্জনকল্পে হাল্কা গাল-গল্প, ফষ্টি-নষ্টির ঘোর বিরোধী তিনি। স্বামী প্রণবানন্দ আপন ব্যক্তিত্বে অত্যন্ত Serious —গম্ভীর। সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত হয় এমন জটিল কোন মতবাদের প্রসঙ্গ আচার্য্যের কোন উক্তির ভিতরে পাওয়া যাবে না। তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের বাক্সর্ব্বস্ব বিতর্কের খোরাক যোগাতে তাঁর আবির্ভাব নয়। তিনি এসেছিলেন জনসাধারণের কল্যাণ ও সংহতি বিধানে। তাই মানুষের সহজবোধ্য উপায়ের কথা চিন্তা ক'রেই বলেছেন—“ধর্ম্মের উচ্চতর ভাব (তত্ত্ব) জনসাধারণের জন্য নয়। সমাজে পরিবারে নানাবিধ সম্বন্ধ, দায়িত্ব ও কর্ত্তব্যের মধ্যে ধর্ম্মের

জটিল মতবাদের লড়াই নয়, চাই সহজ সত্যের প্রচার

যে আদর্শের প্রকাশ বিকাশ তাই তো জনসাধারণের ধর্ম্ম, তাকে অবলম্বন ক'রেই সমষ্টি-জীবন গড়ে উঠে। সমাজের মধ্যেই ধর্ম্মের লৌকিক রূপ প্রকটিত হয়।" এখানেও স্বামী প্রণবানন্দের মতবৈশিষ্ট্য লক্ষ্যণীয়। হিন্দুর ভিতরে যে শত প্রকার অনৈক্য ও পার্থক্য তা তো কেবল সামাজিক কারণে নয়, ধর্ম্মীয় এবং দার্শনিক মতবাদের দ্বন্দ্বও হিন্দুকে কম খণ্ডিত করে নি। এই সকল বিচিত্র ও পরস্পর-বিরোধী মতবাদীদিগকে এক সাধারণ ক্ষেত্রে আনয়ন সত্যই অতি দুরূহ ব্রত। স্বামী প্রণবানন্দ সেই দুঃসাধ্য কর্ত্তব্য সাধনেরই পথিকৃৎ। তিনি আবিষ্কার করেন সমস্যার মূল শিকড়টিকে, আর কাজ আরম্ভ করেন সেই গোড়া ধ'রে।

সামাজিক কর্ত্তব্য ও পারস্পরিক সম্বন্ধের ভিতরেই ধর্ম্মের লৌকিক রূপের প্রকাশ

স্বামী প্রণবানন্দের অভ্রান্ত প্রত্যয়—ব্যক্তির সমষ্টি নিয়ে রচিত হয় পরিবার, পরিবারের সমষ্টি নিয়ে গোষ্ঠী বা সমাজ, আর গোষ্ঠীগত সমাজের সমষ্টি নিয়ে বৃহত্তর জাতির কাঠামো। আমূল সংস্কার অর্থটা কি? ব্যক্তিচরিত্র গঠন ব্যতীত কি সুস্থ সমাজ গঠন সম্ভব? সুস্থ পরিবার গঠনকে অবহেলা-পূর্ব্বক সুস্থিত সমাজ-গঠনের প্রয়াস কি বালুকা ভিত্তির উপর সৌধ নির্ম্মাণের মত হাস্যকর ব্যাপার নয়? আর সুস্থিত সমাজ-ব্যবস্থার অভাব যেখানে, সেখানে ঐক্যবদ্ধ আদর্শ জাতিগঠন তো অলীক স্বপ্নমাত্র। কোন সংস্কারকামী মনীষীই এই ক্রমের তাৎপর্য্য সঠিক বুঝেছেন কি? তাঁদের প্রবর্ত্তিত তাৎক্ষণিক সংস্কার আন্দোলনগুলি তাৎক্ষণিক কিছু চমক দেখিয়ে হাউই বাজির মত নিমেষে গেছে নিভে। স্বামী প্রণবানন্দ কিন্তু কাজ আরম্ভ করেন প্রাগুক্ত বাস্তব ক্রমের মূল অনুসরণে। সর্ব্ব প্রথম ব্যক্তিচরিত্র গঠন, দ্বিতীয় স্তরে পারিবারিক জীবনের সুষম বিন্যাস, তৃতীয় ক্রমে সমাজের আপাতঃ বিরোধ সমূহের নিরসনপূর্ব্বক ঐক্যানুকূল বাতাবরণ সৃষ্টি। হিন্দুর ভিতরে অখণ্ড ঐক্যের প্রতিষ্ঠাই বহুধর্ম্মমতের মানুষকে এক জায়গায় এনে ভারতে জাতীয় সংহতি গড়ে তোলার

সংস্কার আন্দোলনের সোপানত্রয়

প্রয়াস সফল করতে পারে। সেকুলার রাজনীতিতে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নি এবং পরিস্থিতিগত অস্থিরতা লক্ষ্যপূর্ব্বক ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়—এ পথ ভ্রান্ত।

স্বামী প্রণবানন্দ যখন উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র, সেই কালেই কিশোর ও যুবাদের নৈতিক অধোগতি তাঁর কোমল চিত্তকে বেদনার্ত্ত করে। ভাবী কালে যাদের নিয়ে গঠিত হবে আদর্শ পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র তারা আজ কোথায়? ব্রহ্মচর্য্যহীন, সংযমহীন, উন্মার্গগামী যত যুবার দল। সুন্দর সুকোমল নবীন কিশলয়গুলি অকালে কীটদষ্ট। কে বাঁচাবে ওদের? স্বদেশী-স্বদেশী ক'রে কি হবে? যাদের কাজ করতে হবে তারা মনুষ্যত্ববিহীন হয়ে যাচ্ছে। চরিত্রই জাতির শ্রেষ্ঠ সম্পৎ। চরিত্রের গৌরবই যদি হারিয়ে যায়, তবে তো সেইখানেই জাতি পরিণত হয় যথার্থ সর্ব্বহারায়। চরিত্রহীন পরিবার সমাজ ও রাষ্ট্র নরক নয় তো কি?

ব্যক্তিচরিত্র গঠনে প্রণবানন্দ

সংস্কার, সংগঠন বা সমৃদ্ধি সবই তো মানুষকে নিয়ে এবং মানুষেরই জন্য। তাই নৈতিকতার ভিত্তিতে মানুষ গঠন চাই সর্ব্বাগ্রে। স্বামী প্রণবানন্দের প্রথম সবিশেষ দৃষ্টি পড়ে সংযম-ব্রহ্মচর্য্যহীন, আশা-উৎসাহহীন, বিলাসী, কর্ম্মকুণ্ঠ, ক্ষীণস্বাস্থ্য, কু-অভ্যাসে বিনাশপ্রাপ্ত কিশোর ও যুবাদের প্রতি। যে কাজ আরম্ভ হয়েছিল তদীয় ছাত্রজীবনে, উত্তরকালে সেই কার্য্যের পরিধির বিস্তৃতি ঘটে সমাজের বৃহত্তর ক্ষেত্রে। সঙ্ঘ গঠনের প্রথম পর্ব্বেই তিনি ডাক দেন সহস্র সহস্র বালক, কিশোর এবং স্কুল কলেজে পড়ুয়া যুবাদের। তারা পায় শক্তিসাধনা, ব্রহ্মচর্য্যের উপদেশ, চরিত্রগঠনের শিক্ষা ও দেশসেবার অনুপ্রেরণা। গড়েন তিনি ব্রহ্মচর্য্যবিদ্যালয়, আদর্শ বিদ্যার্থিভবন, ভারতীয় আদর্শে নব শিক্ষায়তন।

কিন্তু মানুষ গঠনের কাজও যথার্থ সফল হতে পারে না, যদি গার্হস্থ্যাশ্রমের পরিবেশ না হয় সুন্দর ও শুচিতাপূর্ণ। গার্হস্থ্যাশ্রমই তো মানুষ গঠনের সূতিকাগার। পিতা-মাতাই দেন সন্তানের জন্ম। সেই পিতা-মাতা দাম্পত্য জীবনে যদি যথেচ্ছ ইন্দ্রিয়পরিসেবী, তবে

স্বাস্থ্যবান্, গুণবান্, শ্রদ্ধাবান্, প্রতিভাবান্, দেশপ্রেমী, সমাজ-হিতব্রতী প্রজার সৃষ্টি হবে কি উপায়ে? তাই আমূল সংস্কারব্রতের এই বিশেষ পর্য্যায়ে স্বামীজী মহারাজ সুস্থ পরিবার গঠনের দায়িত্ব গ্রহণপূর্ব্বক ব্যাপক কার্য্যসূচীর প্রবর্ত্তক। শত সহস্র গৃহীর আগমন হতে থাকে তদীয় ভাগবত মহাজীবনের পূততম সান্নিধ্যে। পায় তারা সাধন, দীক্ষা, উপদেশ, অনুকম্পা ও গুরুশক্তির বিদ্যুৎস্পর্শ। গড়ে উঠে অগণিত স্বধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ হিন্দু-পরিবার।

আমূল সংস্কারের দ্বিতীয় সোপান সুস্থ পরিবার গঠন

অতঃপর তিনি হস্তক্ষেপ করেন হিন্দু-সমাজ-সমন্বয় কার্য্যের বাস্তব রূপায়ণে। সে ইংরাজী ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দ। তখন এক ভয়াবহ দুর্য্যোগের দিন। জাতীয় মহাজাগরণ, মহামিলন ও মহাসমন্বয় সাধনের অন্তরায়গুলি কি? দিব্যদ্রষ্টা পুরুষের তা অজানা ছিল না। যথেষ্ট সন্তর্পণে ও সতর্কতার সহিত বিচার বিবেচনা ক'রে সেই সকল প্রতিবন্ধকতা অতিক্রমণ পূর্ব্বক তিনি স্বীয় সঙ্কল্পসাধনে অচল, অটল। কোন বাধাই গ্রাহ্য হয় নি। তিনি যে সঙ্কল্পসিদ্ধ মহাযোগী।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হয়েছে, আচার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী সংস্কারগুলি সকলই ছিল তাৎক্ষণিক এবং প্রতিক্রিয়াধর্ম্মী। ফলে সংস্কার হয় নি, হয়েছে সংহার। আচার্য্যপ্রোক্ত সমন্বয় শব্দের তাৎপর্য্য এই: প্রত্যেককে তার যথাযোগ্য স্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত রেখে পরস্পরের ভিতরে মিলন, ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব ও সহযোগিতার বন্ধন সংস্থাপন। দেবীবর ঘটকের মত তিনি শ্রেণীতে শ্রেণীতে দোষ খুঁজে বেড়ান নি, করেছেন গুণের সন্ধান। রঘুনন্দনের মত তিনি বর্ণাশ্রমকে গুঁড়িয়ে দিতে চান নি—চেয়েছেন তার দেশকালোপযোগী পুনঃ সংস্কার। দয়ানন্দের মত 'হিন্দু' নামটি মুছে ফেলে দিয়ে নূতন বিতর্কের সৃষ্টি করেন নি—হিন্দুকে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন অখণ্ড হিন্দুত্বের চেতনায়। বলেছিলেন—"আমি হিন্দুকে 'আমি হিন্দু আমি হিন্দু' এই মন্ত্র জপ করাবো।" তিনি ব্রাহ্মণকে নিন্দা করেন নি, আবার শূদ্রকেও ঘৃণা করেন নি। মহাপুরুষের বিচারে—"সবার

প্রণবানন্দের সংস্কার আন্দোলনের মূল চরিত্র

উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।"

ব্রাহ্মণেরা যথার্থ নিষ্ঠাবান্ হউন, মানুষের হিতসাধন করুন—সে তো উত্তম কথা। কিন্তু এ যুগে ক্ষাত্রশক্তি ও বৈশ্যশক্তির পুনরভ্যুত্থানও অপরিহার্য্য। আর শূদ্র মানে শ্রমিক, সেবক। তারা ক্ষুদ্র নয়, ঘৃণার পাত্র নয়। বৈদিক বর্ণাশ্রম ছিল "গুণকর্ম্মবিভাগশঃ", তা বংশগত হয়েই বিভেদের কারণ হয়েছে। শ্রমশক্তি কোন্ সমাজে বা কোন্ দেশে না আছে? শ্রমশক্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে গোটা দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো। শিক্ষাজীবী, ধনজীবী, যুদ্ধজীবীদেরও প্রয়োজন হয় আদর্শ শ্রমিকের। বস্তুতঃ সারা পৃথিবীতে যত মানুষ আছে তার ভিতরে শ্রমিকের সংখ্যাই সর্ব্বাধিক। শ্রমিকের সন্তান যোগ্যতা অর্জ্জনপূর্ব্বক যে কোন ক্ষেত্রে উচ্চ সম্মান লাভের অধিকারী। এতে কেউ বাধার সৃষ্টি করতে পারে না। মধ্যযুগে কেবল স্মৃতিপ্রবন্ধকারদের আভিজাত্যের অভিমান, ব্যাখ্যার অপভ্রংশতা এবং একদেশদর্শিতার ফলেই "শূদ্র" শব্দটি ঘৃণাবাচক হয়ে দাঁড়ায়। স্বামী প্রণবানন্দ চেয়েছেন এর যোগ্য নিরসন। তিনি তাদিগকে ভালবেসেছেন, কাছে টেনেছেন, তাদের ঘরে গিয়ে পক্কান্ন চেয়ে খেয়েছেন, তাদের জন্য গড়েছেন স্কুল ও কল্যাণকেন্দ্র, দিয়েছেন তাদিগকে বিপদে আপদে সাহায্য, সঙ্ঘের উৎসব-পার্ব্বণে তারাও পাচক ও পরিবেশক, এক পঙ্‌ক্তিতে বসে পেয়েছে খিচুড়ি ও মিষ্টান্ন প্রসাদ, এক আসরে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন, এক বৈদিক যজ্ঞে 'ওঁ' ও 'স্বাহা' মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক আহুতি নিবেদন। শূদ্রেরাও পেয়েছে হিন্দুত্বের পূর্ণ অধিকার। আর সেই অধিকার অর্জ্জনে যাতে তারা সফল হয় তার জন্য স্বামী প্রণবানন্দের আন্তরিকতা ও চেষ্টার কি কোন অবধি ছিল? প্রস্তাবিত মহাজাগরণের যুগে কেউ কি আর ঘুমিয়ে থাকবে? সবাই হুহুঙ্কারে উঠবে জেগে। জাগবে দলিতেরাও। কিন্তু এই নব জাগরণ যেন বিভেদাশ্রয়ী না হয়। কারণ, এ যুগ যে মহাজাগরণের যুগ।

শূদ্র শব্দের অপব্যাখ্যা নিরসন

যুগের এই অনিবার্য্য মহাজাগরণকে সুসমন্বিত ক'রে স্বামী

প্রণবানন্দ রচনা করেন এক মহামিলনের স্থায়ী ও সুদৃঢ় ভূমি। আবিষ্কৃত হয় এক অভিনব ও অত্যাশ্চর্য্য কর্ম্মপদ্ধতি। এই কর্ম্মপদ্ধতির নাম—"হিন্দু মিলন-মন্দির।" এই আবিষ্কার লৌকিক বুদ্ধিপ্রসূত নয়—ইহা নব যুগের সিদ্ধ ঋষির দিব্যদৃষ্টিসম্ভূত এক অভূতপূর্ব্ব মহাদান। ঘোষণা করেন—"আমি চিন্তা করছি এমন এক কর্ম্মপরিকল্পনা যা আসন্ন ভবিষ্যতে দেশের সকলকে গ্রহণ না ক'রে উপায় নেই। আমি যে আন্দোলন প্রবর্ত্তন করবো তার দ্বারা জাতিগঠনকল্পে অনুষ্ঠিত যাবতীয় কর্ম্মপন্থাই সাফল্যের পথে অগ্রসর হবে; অথচ কোন প্রতিষ্ঠান বা কোন কর্ম্মপন্থার সহিত বিরোধ থাকবে না।" থিওরিটি (Theory) এই রকম। সমগ্র জগৎটাই অশেষ বৈচিত্র্যময়, কিন্তু এই বৈচিত্র্যের ভিতরেই আছে পরমৈক্য। মানুষে মানুষে ভেদ আছে ঠিক, আবার আছে ঐক্যসূত্রও। হিন্দুসমাজও বহুকালপোষিত ভেদ ও অনৈক্যের অশেষ যন্ত্রণায় ভুগছে। কিন্তু ভেদ দিয়ে কি ভেদ দূর করা যায়? বিবাদ ক'রে কি অন্ধকার অপসারণ সম্ভব? একটি প্রদীপ্তশিখ আলোক জ্বেলে দাও, মুহূর্ত্তে কোথায় যাবে চলে অন্ধকার। স্বামী প্রণবানন্দ ভেদের অন্ধকারে মিলনের আলোক জ্বেলে দিতেই প্রতিষ্ঠা করেন নগরে নগরে পল্লীতে পল্লীতে হিন্দু মিলন মন্দির। দেবীবর ঘটক করেছিলেন দোষে দোষে মেলবন্ধন, আর স্বামী প্রণবানন্দ করেন হিন্দুতে হিন্দুতে মেলবন্ধন। অপরূপ এই কর্ম্মযোজনা!

হিন্দু মিলন মন্দির সর্ব্বশ্রেণীর হিন্দুর সাধারণ মিলন ক্ষেত্র

পূর্ব্বেই উক্ত হয়েছে, স্বামী প্রণবানন্দ সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে দোষদর্শী নহেন, তিনি গুণসন্ধানী। তিনি ভেদে উস্কানি দেন নি, খুঁজেছেন সর্ব্বসম্প্রদায়ের ভিতরে সাধারণ মিলন ও ঐক্যের ক্ষেত্রগুলি। বিবাদের কথা যত তুলবে, বিবাদ ততই উগ্রতার আগুনে জ্বলে উঠবে। তাই বিরোধীয় পথে পা বাড়ানো নয়, প্রথমে সাধারণ মিলনসূত্র ধ'রেই কাজে এগোতে হবে আর এই উপায়েই হবে—মিলনের প্রাথমিক পরিবেশ রচনা। আর কালহরণ নয়—হিন্দুসমাজের আরো সর্ব্বনাশ হওয়ার পূর্ব্বেই ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে

কর্ম্মক্ষেত্রে—সর্ব্বশক্তি নিয়োগে।

যুগাবতার খুঁজে খুঁজে বের করেন মিলন সাধনের কতকগুলি সাধারণ উপকরণ। সমবেত সাপ্তাহিক উপাসনা, হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন, পর্ব্বে পর্ব্বে সার্ব্বজনিক পূজোৎসব, সাধারণের স্বার্থানুকূল স্কুল, ব্যায়ামাগার, গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা, আর্ত্ত ও বিপন্ন প্রতিবেশীর সেবা, গ্রামোন্নয়ন, গ্রাম্য বিবাদাদির আপস মীমাংসা-প্রচেষ্টা—এই প্রকার আরো বহু ক্ষেত্র আছে যেখানে সর্ব্বশ্রেণীর হিন্দুর সমাবেশ আপত্তিজনক নয়। এই সকল অবিরোধী সাধারণ মিলনের সূত্রগুলি আশ্রয় ক'রেই হিন্দু নিয়মিত মিলিত হতে থাকুক উদার মানসিকতায় এবং সমাজকল্যাণের আশু প্রয়োজনীয়তা মাথায় রেখে। দেখবে—এই নিরবচ্ছিন্ন মিলনের অভ্যাসের মধ্য দিয়েই প্রতিটি হিন্দু প্রতিটি হিন্দুর অনেক কাছে এসে গেছে, পারস্পরিক ব্যবধান কমে আসছে, একের প্রতি অন্যের ঘৃণা, দ্বেষ, লজ্জা, দ্বিধা, অভিযোগ, অনুযোগ তিরোহিত হয়ে ক্রমে পারস্পরিক প্রেম, প্রীতি, ভ্রাতৃত্ব, সৌহৃদ্য, সহযোগিতা, সমবেদনা, সেবা, ভালবাসার বন্ধন অবিচ্ছেদ্য মহিমায় সুন্দরতর হয়ে উঠছে। অবশ্য মহামিলনের এই মহাসাধনায় চাই পর্য্যাপ্ত ধৈর্য্য ও নিষ্ঠা। সাময়িক কোন ঘটনা বিশেষের সঙ্ঘাতে হতাশ হলে চলবে না, সাধনায় বিরতি দেওয়া যাবে না। বিশ্বাস রাখতে হবে এই পথই নিত্য ও সত্য—অন্য পথ নেই।

সর্ব্বশ্রেণীর হিন্দুর মিলনের অবিরোধী সাধারণ উপকরণ

এক স্বজাতীয়তার ডাকে মুসলমান মুহূর্ত্তে এককাট্টা হয়। খৃষ্টানের ভিতরেও এই ঐক্য নজরে পড়ে। মসজিদ এবং গীর্জ্জাই এই দুই ধর্ম্মীয় সম্প্রদায়কে একতাবদ্ধ ক'রে রেখেছে। কিন্তু হিন্দু কেন হিন্দুত্বের নামে ঐক্যবদ্ধ হ'তে জানে না? অধ্যাত্ম ভারতের ধর্ম্মীয় ভাণ্ডারে হিন্দুর জন্য কি কোন কম সম্পৎ সঞ্চিত আছে? হিন্দুর আছে বেদ-বেদান্ত, পুরাণ-তন্ত্র, সংহিতা-দর্শন, কাব্য-মহাকাব্য, গীতা-চণ্ডী, আছে তার গঙ্গা-যমুনা-নর্ম্মদা-কাবেরী আদি পুণ্যতোয়া স্রোতস্বিনী, আছে গয়া, কাশী, কাঞ্চী, প্রয়াগ, হরিদ্বার

আদি পাবন তীর্থ, আছে হিন্দুর বারো মাসে তেরোপাবর্বণ। ধার্ম্মিক ও আধ্যাত্মিক সাধনার লক্ষ উপকরণ হিন্দুর নিত্য সেব্য আর গুরুমুখী শিক্ষা ও সাধনা অগণিত সাধু-সন্ত, যোগী, ভক্ত, জ্ঞানী ও মহাপুরুষের জন্ম দিয়েছে এই ভারত —যুগে যুগে। ব্যক্তিজীবনে আত্মিক উজ্জীবন সংঘটনে ভারত জগদ্বরেণ্য। কিন্তু এত পেয়েও হিন্দুর এমন কি পাওয়া হয় নি, যার অভাবে হিন্দু ঐক্যচেতনায় এমন দুঃখজনক ভাবে পশ্চাদ্গামী? এই করুণ প্রশ্নের জবাব পাই আমরা স্বামী প্রণবানন্দের দিব্য জীবন, বাণী ও কর্ম্মধারার ভিতর। সবই তো পেয়েছো, শুধু পাওনি একটি অপরিহার্য্য প্রাপ্য। তা হলো হিন্দুর নেই কোন সাধারণ মিলনের ক্ষেত্র বা Common platform. এর অভাবেই হিন্দু স্বধর্ম্ম, স্বজাতি ও স্বসংস্কৃতির সাধারণ পতাকাতলে এক হ'তে পারছে না। যুগপুরুষ সেই অভাব পূরণ করেন তদীয় হিন্দু মিলন মন্দির আন্দোলনের মাধ্যমে। সনাতন হিন্দুধর্ম্মের অধ্যাত্মসাধনায় এটি এক নূতন বাস্তব মাত্রা। ইতঃপূর্ব্বে এই দান আর কেউ দেন নি। কোন মহাপুরুষ, কোন অবতার, কোন দার্শনিক, কোন ধর্ম্মাচার্য্যের নিকট এই দান হিন্দু পায় নি। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে হরিনামের প্লাবন সৃষ্টিপূর্ব্বক উচ্চ-নীচ নির্ব্বিশেষে সর্ব্বশ্রেণীর হিন্দুকে একস্থ করেছিলেন। কিন্তু ধরাছোঁয়ার মত কোন মিলন-ক্ষেত্র হিন্দু সে যুগেও পায় নি। সেই দুর্ল্লভ দান জাতি পেয়েছে স্বামী প্রণবানন্দের ঐশী করুণায়। এখানেই তিনি যুগাবতার—যুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তক।

ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিকতার সাধনায় হিন্দু জগদ্বরেণ্য—ছিল না তার সাধারণ মিলন ভূমি

উক্ত মিলন মন্দির আন্দোলনের স্বরূপ ও সাফল্য তদীয় নিজকণ্ঠেই উদ্গীত—"আমরা রচনা করবো একটা মিলনের ক্ষেত্র, যেখানে সর্ব্বশ্রেণীর হিন্দু একত্র সম্মিলিত হবে। এই মিলন-ক্ষেত্রের নাম হবে—হিন্দু মিলন মন্দির। উহা সর্ব্বশ্রেণীর হিন্দুর মিলন-ক্ষেত্র —সম্মিলিত শক্তিকেন্দ্র। যে কোন সময় যে কোন পর্ব্ব বা অনুষ্ঠান

উপলক্ষ্যে অতি অল্প সময়ের মধ্যে সহস্র সহস্র হিন্দু তথায় সম্মিলিত হবে। এই মিলন-মন্দির হবে ধর্ম্মপ্রচার, শিক্ষাবিস্তার, সমাজ-সংস্কার ও সঙ্ঘশক্তি সংগঠনের কেন্দ্র। এই মিলন-মন্দিরের মধ্য দিয়েই হিন্দুর পরিবার, সমাজ—জাতীয় জীবনের যাবতীয় সমস্যার সমাধান হবে।"

হিন্দু মিলন-মন্দির কি ও তার সাফল্যের রহস্য কোথায়

কত বড় বিশাল পরিধি বিস্তার পূর্ব্বক এই কর্ম্মযোজনার সমুদ্ভব তা বুঝতে কোন ব্যাখ্যার অপেক্ষা আছে কি? সহস্রাব্দের তমসাচ্ছন্ন হিন্দুর ভিতরে যদি একবার অখণ্ড গণচেতনার উদ্দীপ্তি ঘটানো যায়, তবে সেই অনুকূল পরিবেশে যে:কোন কল্যাণকর আন্দোলনই আনা যাক তা সফল হবে না কেন? তাই আচার্য্য বলেছিলেন —"আমার আন্দোলনই শেষ আন্দোলন।" তদীয় ভাগবত মহাজীবনের উপান্তে এই অপূর্ব্ব উপহার তিনি জাতির কল্যাণে দিয়ে গেছেন।

উক্ত মিলন-মন্দিরেব মধ্য দিয়ে তিনি আর এক কালোপযোগী বীর্য্যদৃপ্ত কর্ম্মের প্রবর্ত্তক। তা হলো 'রক্ষিদল' গঠন। তিনি বলতেন —"যে মিলন-মন্দিরের সঙ্গে 'রক্ষিদল' গঠন না হবে, সে মিলন-মন্দির আমি চাই না।" রক্ষিদল এক বলিষ্ঠ, সংহত ও শিক্ষাপ্রাপ্ত প্রতিরক্ষা-বাহিনী। মুসলমান বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গের ক্ষাত্রশক্তি ভেঙ্গে পড়ে। তদুপরি স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ক্ষত্রিয়কে দাসভুক্ত ক'রে হিন্দুর মেরুদণ্ড একেবারে ভেঙ্গে দিয়ে যান। জন্মলাভ করে এক দুর্ব্বল, ক্লীব, পলায়নপর, আত্মরক্ষায় অসমর্থ বাঙালী সমাজ। পাঁচ শত বৎসর ব্যাপী তারা পড়ে পড়ে মার খেয়েছে, কিল খেয়ে কিল চুরি করেছে, চোখের সম্মুখে স্বীয় ধর্ম্মপত্নীর লাঞ্ছনা দেখেও প্রতিরোধে ফুঁসে উঠতে পারে নি। মুসলিম লীগের দুর্ব্বৃত্তপনায় যখন হিন্দুর ধন-মান-প্রাণ বিপন্ন, নারী ধর্ষিতা, অপহৃতা, দেবস্থান চূর্ণিত, গৃহ লুণ্ঠিত, সেই দুর্য্যোগের দুঃসহ যন্ত্রণার দিনে ঐক্যশক্তির সহিত ক্ষাত্রশক্তির উদ্বোধনের প্রয়োজনে রক্ষিদল

ক্ষাত্রশক্তির পুনরুদ্বোধনে রক্ষিদল গঠন

আন্দোলনের সূচনা। তিনি শক্তিকে বড় পছন্দ করেন। বলেন —"যে ধর্ম্ম শক্তিদান করে না, সে ধর্ম্ম আমি চাই না।" ভীরু, কাপুরুষের কোন ধর্ম্ম নাই। হিন্দুর ধর্ম্ম—শক্তির সাধনা, বীর্য্যের সাধনা। হিন্দুর প্রতিটি দেবদেবী অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত, দৈত্যদলনে অপ্রতিহত। শরীরে মনে শক্তি অর্জ্জন কর, শত্রুর মোকাবিলায় হাতে ধর হাতিয়ার। পাঁচ লক্ষ মৃত্যুপণ যুবা নিয়ে রক্ষিদল গঠনের সঙ্কল্প ঘোষিত হয় ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে। বলেন—"হিন্দুর শক্তি অপরিসীম। সম্মুখ সমরে বীরের মত প্রাণ যদি কেউ দিতে পারে, তবে সে এই হিন্দু। তবে হিন্দু আজ তা পারছে না কেন? কেন সে সাম্প্রদায়িক দুর্ব্বৃত্তদের ভয়ে ভীত, শঙ্কিত? কারণ, হিন্দু তো আর হিন্দু নেই। হিন্দু আজ স্বধর্ম্মভ্রষ্ট।" আবার বলেন—"সূর্য্য উঠলে অন্ধকার আপনি দূরীভূত হয়। তখন অন্ধকার অপসারণের জন্য কোন গোলাগুলির (অস্ত্রশস্ত্রের) প্রয়োজন হয় না। তেমনি হিন্দু শক্তিশালী ও সুসংগঠিত হ'লে সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তিসম্পন্ন দুর্ব্বৃত্তেরা আপনিই নিজেদের দুষ্মতি নিয়ে সরে পড়বে।" আবার হুঙ্কার দেন—"দমে গেলে চলবে না। নিজেদের ভিতরে এই spirit চাই যে, আমরাই এখন সকলের অগ্রণী। আমরা সম্মুখ সমরে অগ্রসর। গোলাগুলি (আঘাত-আক্রমণ) যদি পড়ে তবে আমাদের বুকেই তা পড়বে সর্ব্ব প্রথমে। আমরা তা বুক পেতে নিতে প্রস্তুত। আমরা যখন সে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেছি তা থেকে কদাপি পশ্চাৎপদ হই নি। পৃষ্ঠ প্রদর্শন করার লোক আমরা নই।" পাঞ্জাবে শিখগুরু গোবিন্দ সিংহের পরে এমন সংগ্রামী ধর্ম্মীয় নেতা ভারতে আর দেখা গেছে কি?

হিন্দু সঙ্ঘবদ্ধ ও শক্তিশালী না হলে সাম্প্রদায়িক ঐক্য ও সম্প্রীতি আসতে পারে না

তাই ব'লে স্বামী প্রণবানন্দের সংগ্রাম কিন্তু কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নয়—তিনি লড়াই করেছেন সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে। তিনি চেয়েছেন ভারতে সকল ধর্ম্মীয় সম্প্রদায়কে নিয়ে এক অনবদ্য মহাজাতিগঠন। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা গেল, এক

বিশেষ সম্প্রদায় সেই চরিত্রের কোন ঐক্য চায় না—তাদের লক্ষ্য ভারত টুক্‌রো ক'রে পৃথক্ মুসলিম রাষ্ট্র গঠন, আর সেই উদ্দেশ্য সাধনে তারা একান্ত মরিয়া। জাতীয় কংগ্রেসের নগ্ন, অসঙ্গত, অতিরেকী তোষণনীতি সম্পূর্ণ ব্যর্থ। তখনই স্বামী প্রণবানন্দের ঘোষণা—"মিলন হয় সমানে সমানে, সবলে সবলে; সবলে দুর্ব্বলে কদাচ নয়। মুসলিমরা সংখ্যালঘু হয়েও তারা স্বধর্ম্ম ও স্বজাতীয়তার নামে সঙ্ঘবদ্ধ ও শক্তিশালী, আর হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েও এবং বিদ্যা, বুদ্ধি, ধনৈশ্বর্য্যে বড় হয়েও অসংগঠিত ও দুর্ব্বল। হিন্দু যেদিন মুসলমানের ন্যায় সঙ্ঘবদ্ধ ও শক্তিশালী হবে হিন্দু-মুসলমানে প্রকৃত মিলন হবে সেই দিন, তৎপূর্ব্বে নয়।" এই উক্তিতে কোনো বিতর্কের অবকাশ নেই। জগতের চিরন্তন রীতি এই রকমই। মহাভারতের উক্তি—"সাম্যাদ্ধি সখ্যং ভবতি বৈষম্যান্নোপপদ্যতে।" সখ্যতা হয় সমানে সমানে, বৈষম্য থাকলে হয় না। ভারতে হিন্দুই সংখ্যাগরিষ্ঠ। সুতরাং, হিন্দু যদি থাকে দুর্ব্বল, অসংগঠিত, ভেদ-বিবাদে ছিন্ন ভিন্ন, তা হলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি কি রূপে সম্ভব? আর ভারত রাষ্ট্র কি উপায়েই বা হবে শক্তিশালী ও সমৃদ্ধিপরায়ণ? দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিকদের গৌণ স্থান দিয়ে দেশ, সমাজ, রাষ্ট্রের বনিয়াদ কি শক্ত হওয়া সম্ভব? এই সহজ সত্যটি বুঝতে আর কতদিন সময় লাগবে জানি না। স্বামী প্রণবানন্দের জীবন, বাণী ও কর্ম্মলীলার যথার্থ মূল্যায়ন আজো সঠিক হয় নি। স্বাধীন ভারতে দেশের বৈষয়িক উন্নয়ন হচ্ছে অনেকবিধ। কিন্তু আজো হয় নি আমূল সংস্কার। কোথায় জাত-পাতের দ্বন্দ্বের নিরসন? কোথায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি? কোথায় অখণ্ড জাতীয় সংহতির প্রতিষ্ঠা? কোথায় জাতীয় চরিত্রের সম্মুন্নতি? কোথায় সর্ব্বস্বার্থের ঊর্দ্ধে অব্যভিচারী দেশপ্রেম? কোথায় আদর্শ মানুষ? কোথায় দুর্নীতিমুক্ত নেতা ও কর্ম্মী? সবই যেন মৃগতৃষ্ণিকার মায়া। দেশ ও সমাজের এই দুর্গতিই স্বামী প্রণবানন্দের করুণার্দ্র হৃদয় মথিত করেছিল এবং যোগসমাধির অতল ভূমি থেকে তিনি নেমে এসেছিলেন মানুষের পাশে, মানুষের সেবায়।

প্রণবানন্দের সংগ্রাম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নয়, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে

আমি কি করবো, এখনো কেউ জানে না। সকলে হয়তো ভাবে — ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ গ্রামগুলি organise করছে, কিন্তু এতো মাত্র background তৈরী হচ্ছে। দেশে যদি কোন brain থাকে তবে সে বুঝবে — আমি কোন্ পথে চলেছি। আমি যা করবো তা সঙ্ঘের জন্মদিনে বলেছিলাম - এ যুগ মহাজাগরণের যুগ, এ যুগ মহামিলনের যুগ, এ যুগ মহাসমন্বয় ও মহামুক্তির যুগ। ভারতবর্ষ তথা হিন্দুজাতি আবার জাগবে, আবার শক্তিশালী হবে, আমার ইচ্ছাশক্তি থাকবে পশ্চাতে।

— স্বামী প্রণবানন্দ